বাবর নামা

সংকলন

প্রেমময় দাশগুপ্ত



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা • • ১৯৮২

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা, ১৯৮২

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীচিত্তরঞ্জন সরকার
জি. বি. প্রিন্টার্স
৫-বি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

সরকার প্রদত্ত স্বল্প মূল্যের কাগজে আংশিকভাবে মুদ্রিত।

শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরী-কে

আমার বিনম্র অর্ঘ

—প্রেমময়

বাবরের হিন্দুস্তান অভিযান কালে (১৫২৫) মধ্যএশিয়া ও ভারতের মানচিত্র

কি মি 0 ৪00 ৮00 কি মি

উ:
৭০°
৯০°
খিবা
নামানগান
তাসকিন্ট
আন্দিজান
বুখারা
সমরকন্দ
কাসান
হিরাট
কাবুল
কাশ্মীর
পাঞ্জাব
৩০°
কন্দহার
মুলতান
কলাত
পানিপথ
রাজপুত
এল্যাকা দিল্লী
আগ্রা
জয়সলমীর
ব্রহ্মপুত্র
বিহার
গঙ্গা
গুজরাট
মালব
নর্মদা
খান্দেশ
গণ্ডোয়ানা
মহানদী
বঙ্গ
তাপ্তী
বেরার
গোদাবরী
আহমদনগর
উড়িষ্যা
কৃষ্ণা
গোলকুণ্ডা
বিজাপুর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
বিজয়নগর
১০° উ:
৭০° পূ:
৯০°

বাবর নামা

॥ এক ॥

'হিজরী ৮৯৯ সংবতে, রমজান মাসে (জুন, ১৪৯৪ খৃী.), বারো বছর বয়সে ফরঘান রাজ্যের রাজা হলাম আমি।'

হিন্দুস্তানের বাদশা হবার পর নিজের অতি বিচিত্র জীবন-স্মৃতি লিখতে বসে তার সূচনা এই কটি কথা দিয়েই করেছেন বাবর।

বাবর (বাবুর) তার ভালো নাম নয়, ডাক নাম। ভালো নাম জহীরউদ্দীন মুহম্মদ। বিখ্যাত পীর হজরত নসীরুদ্দীন খাজা উবাদুয়েল্লা এই নামটিই রাখেন তার। গোষ্ঠীর লোকদের মুখে এ নামটি সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে বেশ কষ্ট হতো। তাই, বাবর নামেই তাকে ডাকতেন তারা। আর পরে, সেই নামেই বিখ্যাত, ইতিহাস খ্যাত হয়ে গেলেন তিনি।

কল্পনায় রাজা সাজা বা যাত্রাদলে রাজা সাজা এক কথা আর সত্যিকারের রাজা হওয়া অন্য কথা। তাও আবার মাত্র বারো বছর বয়সে।

যাত্রাদলে যিনি রাজা সাজেন তাকে রাজ্য চালাতে হয় না। অভিনয় দিয়ে দর্শক-চিত্ত জয় করে ফেলতে পারলেই বাজিমাৎ করে ফেলেন তিনি। যিনি কল্পনায় রাজা সাজেন তিনি সারাক্ষণ দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকলেও তার রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যায় না। কিন্তু আসল রাজার সে ভয় রয়েছে। তাকে রাজ্য চালাতে হয়, রাজ্য রক্ষার দায়ও কাঁধের উপর তুলে নিতে হয়। আর, শেষ রক্ষা করতে না পারলেই—

বাবর যে যুগের মানুষ, রাজ্য রক্ষা করা খুব সহজ কাজ ছিলনা সে যুগে। তিনি যে অঞ্চলে রাজা হয়েছিলেন, বিশেষ করে সেই মধ্য এসিয়ায় তো নয়ই। সেখানে তখন অনেক রাজা, অনেক রাজ্য। প্রায় সকলেই চেঙিস খান অথবা তৈমুর লঙের বংশধর। তারাই তাদের রাজ-আদর্শ। সকলের চোখেই দিগ্বিজয়ের রঙীন নেশা। চেঙিস খান বা তৈমুরের মতন খ্যাতিমান হবার খোয়াব। অথচ পৃথিবী যে মাত্র একটিই। ফলে সব রাজারই ভাগ্য, রাজ্য সীমানা আর স্থিতি রবারের বেলুনের মতোই অনিশ্চিত। হরেক সময়ে হরেক আকার। কখনো বা ফটাস করে ফেটে গিয়ে পুরোপুরি হাওয়া।

পিতামহ আবু সৈয়দ মীর্জা হলেন তৈমুর বংশীয়। তৈমুরের দ্বিতীয় পুত্র

মীরান শাহের নাতি। রাজ্যশূন্য অবস্থা থেকে বেশ একটি বড়ো রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তিনি আপন প্রচেষ্টায়। হয়ে উঠেছিলেন তৈমুর বংশীয়দের মধ্যে অগ্রগণ্য।

মাতামহ য়ূনস খান ছিলেন চেঙিস খানের বংশধর। মোঙ্গল প্রধান। আবু সৈয়দ মীর্জাই তাঁকে মোঙ্গল প্রধানের আসনে বসতে সাহায্য করেছিলেন। অকৃতজ্ঞ ছিলেন না য়ূনস খান। মৈত্রী বন্ধন সুগভীর করার জন্য আবু সৈয়দ মীর্জার চার ছেলের মধ্যে তিন ছেলের সঙ্গে তিনি তার তিন মেয়ের বিয়ে দেন।

বংশীয় রীতি অনুসারে চার ছেলের মধ্যে আপন রাজ্য ভাগ করে দিয়ে গেলেন আবু সৈয়দ মীর্জা। বড় ছেলে এবং য়ূনস খানের বড়ো জামাই আহমদ মীর্জা পেলেন বুখারা ও সমরকন্দ। দ্বিতীয় ছেলে উলুঘ বেগ মীর্জা পেলেন কাবুল ও ঘজনী (গজনী)। বদকশান, খুতলান এবং হিন্দুকুশ ও অসফর পর্বতমালা মধ্যবর্তী অঞ্চল পেলেন তৃতীয় ছেলে মাহমুদ মীর্জা। ছোট ছেলে উমর শেখ মীর্জার ভাগ্যে জুটলো ছোট ফরঘান রাজ্য। এক মায়ের সন্তান ছিলেন না এরা চার ভাই, ছিলেন চার ভিন্ন ভিন্ন মায়ের।

বাবরের পিতা উমর শেখ মীর্জা ছিলেন ছটফটে, খুনসুঁটে প্রকৃতির মানুষ। উচ্চাকাঙ্খাও ছিল শক্তি ও সাধ্যের তুলনায় বড়ো বেশি। দূরদর্শিতারও অভাব ছিল। দিগ্বিজয়ের নেশা তার দুচোখে রঙ ধরিয়ে দিয়েছিল। পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল আয়তনের ছোট ফরঘান রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না তিনি। দিগ্বিজয়ী তৈমুর লঙের তিনি নাতির নাতি। এতটুকু রাজ্যের শামুক খোলসের মধ্যে অলস হয়ে পড়ে থাকা কি তার শোভা পায়? না কি, তাতে তার মান সম্মান বজায় থাকে?

অতএব পড়শী রাজ্যগুলির সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদ জুড়ে তাদের এলাকার উপর লোভের কামড় বসাতে শুরু করলেন তিনি। কিন্তু দাঁত শক্ত থাকলে তবে তো কামড়ে খাবেন। তাই, প্রতিবারেই উলটো ফল ফললো। নিজের রাজ্যখানিই একটু একটু করে আরো ছোট হয়ে চললো তার। আর, সব থেকে বড় ক্ষোভের কথা, এই জমির বেশির ভাগই গেল আপন শ্বশুর মোঙ্গল-প্রধান য়ূনস খানের কব্জায়।

ক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্বশুরের সঙ্গেই বিবাদ জুড়ে দিলেন উমর শেখ মীর্জা। কিন্তু শক্তিতে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন কেন? তার সৈন্যবাহিনীর

হাতে প্রচণ্ড মার খেলেন তিনি। বন্দী হলেন। শিকলে বেঁধে মোঙ্গল-প্রধানের কাছে হাজির করা হলো তাকে। জামাইকে এ অবস্থায় দেখে উঠে গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিলেন মোঙ্গল-প্রধান। নানা উপহারাদি দিয়ে তাকে আদর-আপ্যায়ন করে উপদেশ দিলেন—এখুনি নিজ রাজ্যে ফিরে যাও। নিশ্চয় সেখানে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়েছে, তা সামলাও গিয়ে আগে। শুধু উপদেশই নয়, নিজেও সপরিবারে এলেন তিনি ফরঘানে। জামাইয়ের সঙ্গে দু মাস কাটিয়েও গেলেন।

মোঙ্গল-প্রধান য়ূনস খানের এই ব্যবহার থেকে মনে হয় জামাইয়ের ভূমি গ্রাস করার কোন কুটিল বাসনা সম্ভবতঃ কোনকালেই তার মনে ছিল না। তাকে সংযত রাখার বাসনা থেকেই বোধহয় তিনি প্রত্যেকবার তার সাহায্যের মূল্য হিসাবে উমরের রাজ্যের অংশ বিশেষ তার কাছ থেকে গ্রাস করে নিচ্ছিলেন।

য়ূনস খান মারা যাবার পর তার রাজ্য মুঘলিস্তান তার দুই ছেলে মাহমুদ খান ও আহমদ খানের মধ্যে ভাগ হল। বড় ছেলে মাহমুদ খানই হলেন মোঙ্গল প্রধান।

এদিকে বার বার ঘা খেয়েও উমর শেখ মীর্জার চৈতন্য হলো না। এরপরও তিনি তার বড় ভাই সুলতান আহমদ মীর্জা ও বড় শ্যালক মাহমুদ খানের সঙ্গে বিবাদ বাধাতে গেলেন।

আহমদ মীর্জাও য়ূনস খানের জামাই, মাহমুদ খানের (সৎ) ভগ্নিপতি। তার উপর ইদানীং তারা বিশেষ মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। এই মৈত্রীকে আরো দৃঢ় করার জন্য মাহমুদ খানের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছে আহমদ মীর্জার মেয়ের। উমর শেখ মীর্জার কার্যকলাপে দুজনেই ক্রুদ্ধ হলেন। চিরকালের মতো তার রাজ্যক্ষুধা মিটিয়ে দেবার সংকল্প করলেন তারা। ঠিক হলো দুদিক থেকে দুজনে তারা সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়ে ফরঘান রাজ্য জয় করে নেবেন। সমরকন্দ থেকে সুলতান আহমদ মীর্জা সির নদীর দক্ষিণ দিকের পথ ধরে এগিয়ে ফরঘানে প্রবেশ করবেন। এগিয়ে যাবেন সোজা রাজধানী অন্দিজান। মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খান এগোবেন গিরিপথ পার হয়ে সির নদীর উত্তর দিক থেকে। আক্রমণ করবেন অখসী দুর্গ।

সংকল্প মতো বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুদিক থেকে এগিয়ে এলেন দুজনে। পরিকল্পনার প্রথম পর্বটিও কার্যকর করলেন সাফল্যের সঙ্গে। ফরঘান রাজ্যের অস্তিত্বই এবার উবে যাবার দাখিল হলো। কিন্তু উমর শেখ মীর্জা দমে গেলেন

না। ধন-সম্পদ-রাজ্য-জীবন বাজী রেখে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। রাজধানী অন্দিজানের রক্ষা ও শাসন ভার শিশু বাবরের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজে এগিয়ে গেলেন অখসী দুর্গ রক্ষার জন্য। বাবরকে সাহায্য করার জন্য রেখে গেলেন খুদা-ই-বীর্দী ও আরো কয়েকজন বিশ্বস্ত বেগ বা আমীরকে।

অখসী পৌঁছে উমর শেখ মীর্জা সঠিক ভাবে সৈন্য সমাবেশ ও প্রতিরক্ষা আয়োজন সম্পূর্ণ করার আগেই এক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটল। উমর শেখ মীর্জা কবুতর পুষতে ও তার খেল-কসরত দেখতে ভালবাসতেন। অখসী দুর্গে একটি কবুতরখানা ছিল তার। এটি তৈরী হয়েছিল একটি খাড়া পাহাড়ের উপর, তার যেদিকটি নদীর দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেখানে। একদিন উমর শেখ মীর্জা যখন সেই কবুতরখানার ভেতর, বাড়িটি আচমকা ধসে পড়লো। ভগ্নস্তূপে চাপা পড়ে সাথে সাথে প্রাণ হারালেন তিনি। বয়স সবে তখন মাত্র ৩৯ বছর। এই শোকাবহ ঘটনার তারিখ ৪ রমজান, ৮৯৯ হিজরী বা ৮ই জুন ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

দুর্ঘটনার খবর পরদিনই চলে এলো অন্দিজানে। শিশু বাবর তখন অন্দিজানের চারবাগে। শুনে যেন আকাশ ভেঙে পড়লো তার মাথায়। কিন্তু শোক করার, অশ্রু ঝরাবার অবকাশ কোথায়? রাজ্য রক্ষাই যে এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে। এক বিন্দু সময় নষ্ট না করে সাথে সাথে তিনি তার অনুগামীদের নিয়ে ছুটে চললেন অন্দিজান দুর্গের দিকে, দুর্গ রক্ষার জন্য। শুরু হল তার অতি অনিশ্চয়তায় ভরা ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর জীবনের সূচনা পর্ব। যা একদিন নাটকীয় উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অতি বিচিত্র গতি নিয়ে অভাবনীয় ভাবে শেষ হয়েছিল দিল্লীর মসনদ অধিকারের পর। সেদিন বাবর ও তার পরিজনেরা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন যে এই বালকই একদিন হবে হিন্দুস্তানে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা? না, তা ভাবতে পারেন নি, পারা সম্ভবও ছিল না।

শিশু রাজার কাছে তখন তো তার অস্তিত্ব রক্ষাই বিরাট প্রশ্ন!

॥ দুই ॥

অনুগামীদের নিয়ে অন্দিজান দুর্গের মীর্জা ফটক বা রাজতোরণের কাছাকাছি হয়েছেন শিশু বাবর। ছুটে এলেন এমন সময়ে শেরীম তঘাই। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে তিনি থামিয়ে দিলেন বাবরকে। বললেন: এ কী করছেন, এ পরিস্থিতিতে দুর্গের ভেতরে যাচ্ছেন? বেগেরা এখন কোন্ পথ ধরবে তার কি ঠিক আছে কিছু! যদি তারা রাজ্যসহ আপনাকে সুলতান আহমদ মীর্জার হাতে তুলে দেয়?

বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেরীম তঘাই নমাজ গাঁয়ে নিয়ে এলেন তাকে। পরামর্শ দিলেন: আউজকিণ্টের দিকে চলে যান আপনি। সেখানকার পাহাড়ী এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকুন কিছুকাল। সময় ও সুযোগ বুঝে চলে যান তারপর দু (সৎ) মামার কারো একজনের কাছে। বড় মামা সুলতান মাহমুদ খান বা ছোট মামা সুলতান আহমদ খান—যার কাছে খুশী।

দুর্গে পৌঁছে গেল এ খবর। সেখানে তখন খাজা মৌলানা-ই-কাজী ও অন্যান্য বেগেরা। সব কথা শুনে তারা তো থ। মনের ভয় ভাঙিয়ে বাবরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্রতী হলেন তারা। পাঠানো হলো খাজা মুহম্মদকে তার কাছে। তিনি হলেন রাজ পরিবারের ওস্তাগর বা দর্জি। বহুকাল ধরে উমর শেখ মীর্জার কাছে কাজ করছেন। সফল হলেন খাজা মুহম্মদ। আশ্বস্ত হয়ে দুর্গে ফিরে এলেন শিশু বাবর।

বাবরকে দেখে কুর্নিশ করলেন খাজা মৌলানা-ই-কাজী। কুর্নিশ করলেন উপস্থিত অন্য সব বেগেরা। তার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করলেন। ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করার জন্য বসলো এবার মন্ত্রণাসভা। চললো, সমগ্র পরিস্থিতির খুঁটিনাটি বিচার। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, মাথা নিচু করা হবে না শত্রুপক্ষের কাছে। সাহসের সঙ্গে তাদের আক্রমণের মোকাবিলা করা হবে।

একমন একপ্রাণ হয়ে ব্রতী হলেন সকলে পূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে। মরঘীনান ও অন্যান্য এলাকা থেকে ইয়াকুব, কাশিম কুচীন প্রভৃতি বেগেরাও ফিরে এলেন ইতিমধ্যে। তারাও যোগ দিলেন দলে।

এদিকে আউরাটীপা, খুজন্দ, মরঘীনান জয় করে নিয়েছেন একে একে সুলতান আহমদ মীর্জা। ক্রমেই কাছ থেকে কাছে এগিয়ে আসছেন তিনি তার বিপুল সেনাদল নিয়ে। অবশেষে একদিন অন্দিজানের কিছু দূরে কবায় এসে ছাউনি ফেললেন।

শত্রু-সৈন্য যে সত্যি সত্যিই এবার প্রায় দোরগোড়ায়। অনেক বীর পুরুষেরই এবার হৃৎকম্প জাগলো। বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাবার জোগাড় হলো। এসে আতঙ্কে জান বাঁচাবার নানা হাস্যকর, লজ্জাকর পথ বাতলাতে শুরু করে দিলেন তারা। একটিও তার ফরঘান রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক নয়। দরবেশ গউ নামের একজন বেগ তো প্রস্তাব দিয়েই বসলেন, শিশু রাজাকে সুলতান আহমদ মীর্জার হাতে তুলে দেয়া হোক। তাতে খুশী হয়ে তিনি নিশ্চয়ই সৈন্য নিয়ে ফিরে যাবেন; অন্দিজানের কোন ক্ষতি করবেন না।

এ প্রস্তাব মেনে নিলে শিশু বাবরের রাজা সাজার এখানেই হয়তো ইতি ঘটতো। কিন্তু ভাগ্য ভালো তার, অতি বিশ্বস্ত ও সাহসী অনুগামীরা দরবেশ গউ-এর কথায় কান দিলেন না। বরং জোটবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতার অভিযোগ আনলেন সকলে। মুণ্ডচ্ছেদ করা হলো তার। দরবেশ গউয়ের এই পরিণতি জাদুর মতো কাজ করলো। যাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল তারা চেতনায় ফিরে এলেন এবার। সৈন্যরাও সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠলো।

শহর যদি অবরোধ করা হয় তবে তার মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন বেগেরা। কিন্তু তার আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য কিছু সময় দরকার। কাল-হরণ করে শত্রু সৈন্যকে কিছুকাল দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তাই শান্তি-আলোচনা জুড়ে দেয়া হলো। আলোচনায় দুই পক্ষ যে সব শর্ত তুললেন তাতে কারো বুঝতে বাকি রইলো না যে কোন পক্ষই শান্তি-মীমাংসায় উৎসুক নন। তখন বাবরের লেখা একখানি চিঠি পাঠানো হলো সুলতান আহমদ মীর্জার কাছে। বেগদের পরামর্শ মতো বাবর লিখলেন: এদেশ শাসনের জন্য কাউকে না কাউকে তো নিযুক্ত করতেই হবে আপনাকে। আমি যেমন আপনার একজন সেবক তেমন আপনারই একজন সন্তান। যদি আমাকে এ শাসন-দায়িত্ব অর্পণ করেন তবে হেসেখেলে. তৎপরতার সঙ্গেই আমি সে দায়িত্ব পালন করে চলবো।

বাবরের ভাষায় সুলতান আহমদ মীর্জা ছিলেন 'নম্র, দুর্বলচিত্ত, স্বল্পভাষী মানুষ'। তিনি এই চিঠির বয়ানের মধ্যে অন্দিজানের বেগদের উচ্চাশার প্রচ্ছন্ন আভাস পেলেন। সুতরাং নিজের আমীরদের সঙ্গেও এনিয়ে কোনরকম পরামর্শ করলেন না তিনি। আমলও দিলেন না প্রস্তাবটিকে। উল্টে, কবা থেকে ছাউনি তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন অন্দিজান অবরোধ করার জন্য।

সুলতান আহমদ মীর্জার এরূপ ত্বরিত পদক্ষেপ বাবর ও তার অনুগামীদের

হতচকিত করে দিলো। দীর্ঘমেয়াদী অবরোধের মোকাবিলা করার মতো প্রস্তুতি তখনো তারা শেষ করে উঠতে পারেন নি। সেনাবাহিনীও দোদুল চিত্ত। নিরূপিত হয় নি, নেয়া হবে কোন্ সমর-কৌশল। বেগদের আনুগত্য সম্পর্কেও সেনাদলের মনে সন্দেহ বর্তমান। অথচ শত্রু-সেনারা এসে রাজধানীর প্রাকারের কাছে ছাউনি গেড়েছে।

কী করা যায় এখন! দুশ্চিন্তায় সকলের চোখ থেকে যখন ঘুম লোপাট এমন সময় ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে বজ্র বিদ্যুতের পরিবর্তে ফুল ঝরে পড়ার মতো এলো শত্রুপক্ষের কাছ থেকে শান্তি-প্রস্তাব। দুর্গের সবাই তো বিস্ময়ে হতবাক। কী ব্যাপার? একি সত্যি না স্বপ্ন!

আসলে শত্রুসৈন্য তখন ঘোর বিপাকে পড়ে গেছে। কবা থেকে অন্দিজান আসার পথে অশেষ হেনস্তা সইতে হয়েছে তাদের। সারা পথ জুড়ে কৃষক ও গ্রামীণ সৈন্যরা নানাভাবে নাকাল করেছে সেনাদলকে। শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য দেশের জনসাধারণ তখন আপনা থেকে গভীর ভাবে উদ্বুদ্ধ। এক প্রাণ এক মন নিয়ে তারা এজন্য পূর্ণ সংকল্পবদ্ধ। দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছ-পা নয় তারা। জনসাধারণের এই মনোভাব বিচলিত করে তুলেছে সুলতান আহমদ মীর্জা ও তার সেনাদলকে। এর উপর দোসর রূপে দেখা দিয়েছে এক ভয়ংকর রোগ। তাদের 'শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে' ঘোড়া এ রোগের কবলে পড়ে প্রাণ দিচ্ছে। বিপুল এই ক্ষতির ফলে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণবল হয়ে চলেছে তারা প্রতিদিন। এই পরিস্থিতির মধ্যে আরো একটি ঘটনা তাদের মনোবল তছনছ করে দিয়েছে। কবা থেকে অন্দিজান আসার পথে কবার জলাভূমি পার হবার জন্য একটি মাত্র সংকীর্ণ সেতুর উপর নির্ভর করতে হয়েছে তাদের। সৈন্যদল বিপুল। ফলে সেতুর উপর বিরাট ভিড় ও চাপের সৃষ্টি হয়। অনেক সৈন্য, ঘোড়া আর উট, সেই চাপে সেতু থেকে জলাভূমির মধ্যে খসে পড়ে প্রাণ হারায়। এ ঘটনাটিও সুলতান আহমদ মীর্জার সৈন্যবলের যথেষ্ট হ্রাস ঘটিয়েছে। তিন-চার বছর আগে সির নদী পার হতে গিয়ে তিনি যে বিপাকের মধ্যে পড়েন এ ঘটনা সেই স্মৃতি জাগিয়ে দিলো তার মনে। ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি প্রাণ নিয়ে দেশে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। তাই, অন্দিজানে পৌঁছে ছাউনি গাড়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শান্তি প্রস্তাব পাঠালেন শিশু বাবরের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাবে সাড়া দিলেন বাবর ও তার অনুগামীরা। ইয়াকুবের ছেলে হাসানকে পাঠানো হলো শান্তির শর্ত স্থির করার জন্য। নমাজ-গাঁয়ে দু পক্ষের বৈঠক বসলো। আলোচনার পর স্থির হলো শান্তির সর্ত। সম্পাদিত হলো চুক্তি। যেরূপ দ্রুত এগিয়ে এসেছিলেন সুলতান আহমদ মীর্জা, তেমনি দ্রুত বেগে এবার নিজ রাজ্য সমরকন্দের দিকে ফিরে চললেন।

কী কী শর্তে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা কোথাও বলেন নি বাবর। তবে আগে তিনি জানিয়েছেন, এই অভিযানকালে সুলতান আহমদ মীর্জা ফরঘানের তিনটি জেলা অধিকার করে নেন। আউরাটীপা, খুজন্দ এবং মরঘীনান। কিন্তু, ফিরে যাবার পথে, উমর শেখ মীর্জার মৃত্যুর মাত্র চল্লিশ দিন পরেই সুলতান আহমদ মীর্জার মৃত্যু হয়। আর এ সময়ে বাবর তার রাজ্য সীমার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে প্রথম দুটি জেলার উল্লেখ থাকলেও তৃতীয়টির নেই। এ থেকে মনে হয় চুক্তিকালে সম্ভবতঃ তিনি মরঘীনান জেলাটি বাবরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সুলতান আহমদ মীর্জার দুর্ভাগ্যের জন্যেই হোক, আর নিজের সৌভাগ্যের জন্যই হোক, প্রথম বিপদটি এমনিভাবে কাটিয়ে উঠলেন শিশুরাজা। কিন্তু তাই বলে এখনো তিনি নিরাপদ নন। দ্বিতীয় বিপদও যে ততক্ষণে তার দুয়ারে ধাক্কা দিতে চলেছে।

সুলতান আহমদ মীর্জার সঙ্গে চুক্তি মতো খুজন্দ নদীর উত্তর দিক থেকে বড়ো মামা মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খানও যে ফরঘান রাজ্যে ঢুকে পড়েছেন ইতি-মধ্যে। অবরোধ করেছেন অখসী দুর্গ। আর, এ খবর পেয়ে ওয়েইস লাঘরী ও মীর ঘিয়াস তঘাই কাসান দুর্গ থেকে পালিয়ে গিয়ে অখসীর কাছে তার দলে যোগ দিয়েছেন। সঙ্গে নিয়ে গেছেন শিশু রাজার তৃতীয় বা ছোট ভাই নাসির মীর্জাকে।

না। অখসী দুর্গে থাকা বেগেরা তাই বলে দমে গেলেন না। শিশু রাজার পরবর্তী ভাই জহাঙ্গীর মীর্জা, আলী দরবেশ বেগ, মীর্জা কুলী কুকুলদাস, মুহম্মদ বাকির বেগ, শেখ আবদুল্লা ও অন্য সকলে অনমনীয়ভাবে দুর্গ রক্ষা করে চললেন। প্রবল বিক্রমে প্রতিরোধ করে চললেন মোঙ্গল প্রধানের সেনাদলের আক্রমণ।

মাহমুদ খান বার বার আক্রমণ করে চললেন। তবু পারলেন না কোন-রকম সুবিধা করে উঠতে। অন্দিজান থেকে জোটের শরিক সুলতান আহমদ

মীর্জার পিছু অপসরণের খবর তাকে দমিয়ে দিয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন মোঙ্গল-প্রধান। একটানা অবরোধ ও আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন বুঝে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন তিনি। অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়ে ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে, তাসকিন্টে।

দ্বিতীয় বিপদও ভয়ংকর হয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ নিষ্কৃতি দিয়ে চলে গেলো এমনি করে। কিন্তু তবুও বিপদ শিশু রাজাকে ছাড়লো না। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি যে প্রশাসনের দিকে, রাজ্য-সংগঠনের দিকে মন দেবেন সে যুগের সুবিধাবাদী রাজনীতি সে সুযোগ তাকে দিল না। সকলের চোখেই যে দিগ্বি-জয়ের নেশা, পর-রাজ্য গ্রাসের দিকে নজর। আর ফরঘান তো সকলের দৃষ্টিতেই এখন অনাথ রাজ্য। পিতৃহীন তিন নাবালক শিশু তার উত্তরাধিকারী। তারাও আবার এক মায়ের সন্তান নয়। এবং এরই একজন সে রাজ্যের সিংহাসনে। তাকে গ্রাস করার এমন সহজ সুযোগ কে ছাড়তে চায়?

কাশগড় ও খোটানের রাজা আবু বকর বহুদিন থেকেই তক্কে তক্কে ছিলেন। তার অভ্যুত্থান বেশি দিনের ঘটনা নয়। কাশগড় ও খোটান জয় করে নিয়ে একটি ছোটখাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। কী করে রাজ্যের আয়তন আরো বাড়াবেন সর্বদা সেই চিন্তা। প্রতিবেশী ফরঘান রাজ্যের উপর প্রথম থেকেই তার লোভ। সুযোগ পেলে যাতে সহজেই কামড় বসাতে পারেন সে জন্য দূরদর্শীর মতো আগে থাকতেই আউজকিণ্টের কাছাকাছি একটি দুর্গ গড়ে রেখেছেন। যুদ্ধের সুযোগ তৈরী করার জন্য সুবিধা পেলেই উপদ্রব করে চলেন সেখান থেকে। উমর শেখ মীর্জার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার লোভের জিভখানা লক লক করে উঠলো। কিন্তু ফরঘানের বুকে তখন একদিক থেকে সুলতান আহমদ মীর্জা, অন্যদিক থেকে মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খান। তাই নিরুপায় হয়েই নিজেকে এতক্ষণ সংযত রেখেছিলেন। তারা দুজনে সরে যেতেই তিনি ভাবলেন এই-ই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। বালক রাজাকে থিতু হয়ে বসতে দেয়া কোনমতেই উচিত হবে না। অতএব তিনি দেরি করলেন না আর। ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাথে সাথে।

কিন্তু সামলে উঠতে পারলেন না আবু বকর। আসলে, হিসাবে একটু ভুলই করে ফেলেছেন তিনি। সুলতান আহমদ মীর্জা ও মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খানের মতো দুজন শক্তিধর রাজার শক্ত হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরে বালক রাজা বাবর, তার আমীর ও সৈন্যদের সকলেরই আত্ম-

প্রত্যয়, মনোবল বেড়ে গিয়েছে তখন। তাই আবু বকর তাদের রাজ্যে কামড় বসাতেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন তারা তাকে হটিয়ে দেবার জন্য। এ দৃশ্য আশা করেন নি আবু বকর। ভেবে ছিলেন, একরকম বিনা প্রতিরোধেই ধাপে ধাপে গ্রাস করে নিতে পারবেন ফরঘান। কিন্তু তার বদলে বলিষ্ঠ সাহসী পদক্ষেপে সৈন্যদের এগিয়ে আসতে দেখে কুঁকড়ে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি শান্তি-আলোচনা শুরু করলেন। যাতে তিনি বিনা বাধায় নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন সেজন্য অনুমতি চাইলেন শিশু রাজার কাছে।

আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে এতদিনে একটুখানি রোদের আভাস দেখা দিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বাবর। তবে, খুব খুশী মনে নয়। রাজ্য টিঁকে গেলেও আয়তন তার ইতিমধ্যেই কিছুটা ছোট হয়ে গেছে।

শক্রমুক্ত হয়ে বাবর ও তার বেগেরা এবার রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দিকে মন দিলেন। দৃষ্টি দিলেন প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের দিকে। অন্য সব খুঁটিনাটি সমস্যার দিকেও নজর দেবার মতো ফুরসুত হলো।

প্রয়াত উমর শেখ মীর্জার পরিবারবর্গও এবার অখসী থেকে অন্দিজান উপস্থিত হলেন। প্রথা অনুসারে শোক পালিত হলো। দুস্থ ও অনাথদের মধ্যে বিতরিত হলো অন্ন ও খাদ্য দ্রব্যাদি।

বাবরের মাতামহী অইসান দৌলত বেগম এবার মন দিলেন সেনা-প্রশাসন ব্যবস্থার দিকে। অতি বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন তিনি। রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা আসলে তার হাতেই ছিল। তার নির্দেশ উপদেশ মতোই সব কাজ চলতো। বোধহয় মাতামহীর পরামর্শ মতোই বাবর এবার হাসান-ই-ইয়াকুবকে অন্দিজানের সরকারের অধীনে কর্মে নিযুক্ত করলেন। অন্দিজান দুর্গের প্রধান ফটক রক্ষার ভার তার উপর অর্পণ করা হলো। আউশ জেলার শাসন-দায়িত্ব দেয়া হলো কাশিম কুচীনের উপর। উজুন হাসান পেলেন অখসী প্রদেশের শাসনভার। আলী দোস্ত তঘাইকে দেয়া হলো মরঘীনানের প্রশাসন দায়িত্ব। বিভিন্ন দায়িত্বে লোক নির্বাচনের বেলা পুরানো ও নতুন উভয় আমীর ও অভি-জাতদের কথা বিচার বিবেচনা করা হলো। উপেক্ষা করা হলো না কাউকেই। এই দুর্বিপাকের সময় যিনি যে পরিমাণ সেবা ও সহযোগিতা করেছেন তার গুরুত্ব ও ব্যক্তি-মর্যাদা অনুসারে কাউকে দেয়া হলো পরগণা (বিলায়ত), কাউকে জমি (ইর), কাউকে কাছারী (মৌজা), দায়িত্ব (জিগা) বা বৃত্তি (ওয়াজহ)।

কিন্তু নিরুপদ্রব জীবন যে বাবরের জন্য নয়। তাই এসব কাজ শেষ করে

উঠতে না উঠতেই এক নতুনতর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো তাকে। এবারের আঘাত এলো তার ছোট জেঠা সুলতান মাহমুদ মীর্জার কাছ থেকে।

বাবরের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করে ফিরে যাবার পথে বড় জেঠা সুলতান আহমদ মীর্জার মৃত্যু হয়। বয়স তখন তার মাত্র ৪৪ বছর। কোন পুত্র সন্তান ছিল না তার। অথচ রাজ্যটি ছিল মোটামুটি বড়ই। সমরকন্দ, বুখারা, তাসকিণ্ট, সইরাম, খুজন্দ ও আউরাটীপা। শেষের অঞ্চল দুটি বাবরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া। তার মৃত্যুর পর প্রশ্ন দেখা দিল, কে এ রাজ্যের সিংহাসনে বসবেন, এতো বড় রাজ্য চালাবেন? বেগ বা আমীররা একমত হয়ে শেষ পর্যন্ত তার তৃতীয় ভাই সুলতান মাহমুদ মীর্জাকে নির্বাচিত করলেন। তখন তিনি বদকশান এবং অস্ফর ও হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্যমতী এলাকার অধিপতি। আমীররা তাকে সমরকন্দের সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানাতে সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন তিনি। পাঁচ ছেলে তার। বড় ছেলে মসুদ মীর্জার উপর হিসার (বদকশান)-এর ও দ্বিতীয় ছেলে বৈশুঙ্ঘর মীর্জার উপর বুখারার শাসনভার অর্পণ করে তিনি নিজে চলে এলেন সমরকন্দে। এভাবে নিজের ও বড় ভাইয়ের মিলিয়ে তিনি সহসা এক বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসলেন। একজন জবরদস্ত ও অভিজ্ঞ প্রশাসক ছিলেন তিনি। রাতারাতি এতো বড় রাজ্য পেয়ে অর্থেরও অভাব হলো না। সুতরাং অল্পকালের মধ্যেই নতুন রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু তার কতক প্রশাসনিক পদক্ষেপ রাজ্য মধ্যে বিশেষভাবে অপ্রিয় করে তুললো তাকে। তার নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারা এবং আমীরদের অশেষ অর্থ-পিপাসার দরুন রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের উপরও পীড়নের অন্ত ছিল না।

আভ্যন্তরীন প্রশাসন ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করতে না পেরে পররাষ্ট্র নীতির সাহায্যে রাজ্যসীমা বাড়িয়ে খ্যাতি অর্জনের দিকে ঝুঁকলেন সুলতান মাহমুদ মীর্জা। এ ক্ষেত্রে সবার আগে নজর পড়ল তার ফরঘান রাজ্যের উপর। ছোট ও দুর্বল রাজ্য। উমর শেখ মীর্জার মৃত্যুর পর এখনো সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা-স্থিতি ফিরে আসে নি। সব চেয়ে সুবিধার কথা তিন নাবালক সৎ-ভাই। জহীরুদ্দীন মুহম্মদ (বাবর), জহাঙ্গীর মীর্জা ও নাসির মীর্জা। নাবালক বাবরই রাজা হয়ে রাজ্য চালাচ্ছে। তিন সৎভাই যখন, ঐক্যে ফাটল ধরাতে বেশি সময় লাগবে না। প্রত্যেকেরই পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু না কিছু আমীর রয়েছে। লোভের টোপ ফেলে এদের কিনে নিজের কার্যসিদ্ধি করা

খুব কঠিন হবে না। এসব ভেবে রাজনীতিক দাবার ঘুঁটিটি সেই ভাবেই চাললেন সুলতান মাহমুদ মীর্জা।

আগমন ঘটল আবদুল কদ্দুস বেগের। সুলতান মাহমুদ মীর্জার বড় ছেলে মসুদ মীর্জার সঙ্গে প্রয়াত আহমদ মীর্জার দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে। সুলতানের হয়ে সেই বিয়ে উপলক্ষ্যে বাবর ও তার পরিবার বর্গকে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন তিনি। সঙ্গে এনেছেন সোনা ও রূপায় তৈরী অনেকগুলি বাদাম উপহার। আসার বাহ্য উপলক্ষ্য এই নিমন্ত্রণ হলেও মনের গোপন অভিসন্ধি কিন্তু অন্যরকম। আবদুল কদ্দুস বেগ হাসান-ই-ইয়াকুবের আত্মীয়। অন্দিজান দুর্গের দ্বাররক্ষক হাসান-ই-ইয়াকুব। বাবরের বিপক্ষ দলভুক্ত আমীর তিনি। তাকে ও তার সঙ্গীসাথীদের হাত করার মতলব নিয়েই আবদুল কদ্দুস বেগকে বাবরের রাজসভায় পাঠিয়েছেন সুলতান মাহমুদ মীর্জা। কতক প্রলোভন দেখিয়ে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে, হাসানকে দলে টানলেন তিনি। অভিসন্ধি চরিতার্থ হতেই ফিরে গেলেন সমরকন্দ।

বালক বাবরের রাজত্বকাল তখন সবে দু'মাস হয়েছে কি হয়নি। এমন সময়ে, ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, তাকে হটিয়ে তার পরের ভাই জহাঙ্গীর মীর্জাকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে মাতলেন হাসান। বাবরের প্রতি বিরূপ আমীরদের মধ্যে মুহম্মদ বাকির বেগ, সুলতান মুহম্মদ দুলদাই ও তার পিতা প্রভৃতিকেও দলে টানলেন। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকরী করার আগেই সব ফাঁস হয়ে গেলো। হাসানের হাবভাব কথাবার্তা থেকে বাবরের সমর্থক আমীররা তার কুমতলব আঁচ করতে পারলেন। খাজা কাজী, কাশিম কুচীন ও আলী দোস্ত তঘাই সাথে সাথে ছুটে এলেন বাবরের মাতামহীর কাছে। জানালেন তাকে এই ষড়যন্ত্রের কথা। সব শুনে তাদের দমন করার ভার আপন কাঁধে তুলে নিলেন অইসান দৌলত বেগম।

মাতামহীর নির্দেশমতো কয়েকজন বিশ্বস্ত বেগকে সঙ্গে নিয়ে বালক বাবর নিজেই গেলেন বিশ্বাসঘাতকদের বন্দীকরতে। দুর্গের বহিপ্রাকারের ফটক-ভবনে হাসানকে বন্দী করার জন্য এলেন তারা। জানতে পেলেন সে এখন দুর্গে নেই। বাজপাখী দিয়ে শিকার করার জন্য বাইরে গেছে। অতএব, তার সমর্থকদেরই বন্দী করা হলো শুধু।

পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেছে, তার দোসররা এখন কারাগারে এ খবর পেয়ে

আর অন্দিজান মুখো হলেন না হাসান। সুলতান মাহমুদ মীর্জার সহায়তা লাভের জন্য ছুটলেন সমরকন্দের দিকে। যেতে যেতে হঠাৎ তিনি মত পরিবর্তন করলেন কন্দ-ই-বদামে পৌছে। সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ে অখসী দখল করে নেবার মতলব ফাঁদলেন। ভাবলেন, এখানকার দুর্গটি দখল করে নিতে পারলে ভবিষ্যতে অন্দিজানের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য তাকে মূলশিবির হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। আবার জোটের শরিক সুলতান মাহমুদ মীর্জার আগমনের জন্যও প্রতীক্ষা করা যাবে সেখানে। অতএব অখসী অভিযানে এগিয়ে চললেন হাসান।

হাসানের মতলবের কথা জানতে পেলেন অইসান দৌলত বেগম ও বাবর। তার ফিকির বানচাল করে দেবার জন্য, সৈন্য পাঠানো হলো জন কয়েক আমীরের নেতৃত্বে। সেনাবাহিনীর আগেভাগে এক সন্ধানীদলও পাঠানো হলো। এ খবর পেয়েও হাসান দমলেন না। সেনাদলের মুখোমুখি হবার জন্য এগিয়ে এলেন তিনি। রাতের অন্ধকারে সহসা ঘিরে ফেললেন ফরঘানের সেনাছাউনি। এলোমেলোভাবে বেপরোয়া তীর ছোঁড়াছুড়ি শুরু হলো। সেই অন্ধকারের মধ্যে নিজ দলের তীরন্দাজের ছোঁড়া একটি তীর হঠাৎ এসে বিঁধলো হাসানের গায়ে। তাতেই প্রাণ হারালেন তিনি। তার বেহিসাবি পরিকল্পনার এ ভাবেই সমাধি ঘটলো।

ফরঘান রাজ্য আপন দখলে এনে খ্যাতি অর্জন করার যে চাল সুলতান মাহমুদ মীর্জা চেলেছিলেন তা এভাবে কেঁচে গেলো। নতুন কোন চাল দিয়ে তা সফল করার সুযোগও তিনি আর পেলেন না। তার আগেই মৃত্যু তাকে এ লোক থেকে অন্য লোকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তাকে আচমকা বিদায় নিতে হলো পৃথিবী থেকে।

শিশুরাজা সিংহাসনেই থেকে গেলেন।

।। তিন ।।

ঘটনা ও পরিবেশ নামের বাজীকরদের হাতের খেলার পুতুল হয়ে তাদের সূতোর টানে টানে এতকাল নেচে চলছিলেন বাবর। তারাই তাকে জন্ম দিয়েছে রাজার ঘরে, বসিয়েছে বালক বয়সে সিংহাসনে। গভীর সংকটের মধ্যে ফেলে তারাই তাকে নাটকীয় ভাবে উদ্ধার করেছে তার আবর্ত থেকে। কিন্তু, আর তিনি খেলার পুতুল হয়ে থাকতে চাইলেন না। তার দেহের শিরায় শিরায় তৈমুরলঙ আর চেঙিস খানের শোণিত-প্রবাহ। সে শোণিত খেলার পুতুল হয়ে থাকতে জানে না। পিতামহীর মুখে এই দুই প্রবাদ, প্রতিমেয় শৌর্য-বীর্যের কাহিনী শুনে শুনে কর্মচঞ্চল ও সাহসী বাবরের মনে ডালিম ফুলের কুঁড়ির মতো সাম্রাজ্যের স্বপ্ন পাপড়ি মেলতে শুরু করেছে। মাতামহী অইসান দৌলত বেগমের শিক্ষা ও প্রেরণা থেকে তার মনে সঞ্জীবিত হয়েছে পুতুল হয়ে না থেকে বাজীকর হবার বাসনা। পূর্ব-পুরুষ তৈমুরলঙের রাজধানী সমরকন্দের সিংহাসন থেকে ছোট জেঠা মাহমুদ মীর্জার আকস্মিক প্রস্থানের পর সমরকন্দ হয়ে উঠেছে তার কাছে পরম আকাঙ্খার নগরী।

এখুনি সমরকন্দের দিকে হাত বাড়ানো বামন হয়ে চাঁদ পাড়ার জন্য হাত বাড়ানোর সমান। তাই নিজেকে সংযত রাখলেন তিনি। শুধু গভীর আগ্রহের সঙ্গে নজর রেখে চললেন সেখানকার রাজনৈতিক পরিবেশ ও ঘটনা প্রবাহের উপর। মন দিলেন নিজের শক্তিকে সংহত ও সংগঠিত করার দিকে।

সুলতান মাহমুদ মীর্জার মৃত্যু সমরকন্দের পরিস্থিতি বেশ ঘোলা করে তুলল। শুরু হয়ে গেল ক্ষমতাসীন আমীরদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে নির্লজ্জের মতো কাড়াকাড়ি, লড়াই। সোচ্চার হলো রাজ্যকে ভাগ ভাগ করার দাবি। পাঁচ ছেলে এগারো মেয়ে মাহমুদ মীর্জার। সমরকন্দ আসার সময় প্রথম ছেলে মসুদ মীর্জার উপর অর্পণ করেছিলেন হিসারের শাসন দায়িত্ব। আর দ্বিতীয় ছেলের উপর বুখারা। সুলতানের মৃত্যুর পর বারোদিন বাইরের লোকের কাছে সে খবর গোপন রাখলেন উজীর খুসরাউ শাহ। তাল করলেন সমরকন্দ ও তার রাজকোষ দখল করে নেবার জন্য। কিন্তু তার সে ফিকির ব্যর্থ হলো। সমরকন্দবাসীরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখতো। তারা বিদ্রোহ করে বসলো তার বিরুদ্ধে। আহমদ হাজী বেগ ও অন্যান্য তরখান প্রধানরা দমন করলেন সে বিদ্রোহ। উজীর খুসরাউ সাহকেও সমরকন্দ থেকে নির্বাসিত

করলেন। রক্ষীদলের পাহারায় তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো হিসার। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে নির্বাচিত করলেন তারা সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র বৈশুঙ্ঘর মীর্জাকে।

এই মনোনয়নে মসুদ মীর্জাও তার সমর্থকেরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি সুলতান মাহমুদ মীর্জার জ্যেষ্ঠ-পুত্র। পূর্বতন সুলতান আহমদ মীর্জার দ্বিতীয় কন্যাকেও বিয়ে করেছেন আবার। তার সমর্থক আমীররা তাকে সিংহাসনে বসাবার জন্য সাহায্য চাইলেন মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খানের কাছে। আবেদনে সাড়া দিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সমরকন্দ দখলের জন্য এগিয়ে এলেন মোঙ্গল-প্রধান। কান-বাঈ জয় করার জন্য প্রথম সেদিকে অগ্রসর হলো তার বাহিনী। বৈশুঙ্ঘর মীর্জাও চুপ হয়ে রইলেন না। মোঙ্গল বাহিনীকে বাধা দেবার জন্য তিনিও কান-বাঈ গেলেন তার সেনাবাহিনী নিয়ে। বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। মোঙ্গল সেনাবাহিনী দারুন-ভাবে পরাজিত হলো সে যুদ্ধে। প্রধান সেনানায়ক হায়দার কুকুলদাস বন্দী হলেন। বন্দী হলো অসংখ্য সৈন্য। বন্দীদের কোতল করার আদেশ দিলেন বিজয়ী বৈশুঙ্ঘর মীর্জা। তার উপস্থিতিতে তার শিবিরের সামনে একের পর এক কোতল করা হতে থাকলো তাদের। বন্দীদের সংখ্যা এরূপ বিরাট যে এভাবে কোতল করার জন্য তিন তিনবার শিবির স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন বৈশুঙ্ঘর মীর্জা।

কান-বাঈয়ের যুদ্ধে বিপুলভাবে জয়লাভের পর নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে মনোযোগী হলেন বৈশুঙ্ঘর মীর্জা। শুরু করলেন রাজ্যবিস্তার অভিযান। বাবরকেও সতর্ক হতে হলো এর ফলে। সে অভিযানের ঢেউ তার ছোট রাজ্যটির উপরও আছড়ে পড়লো। তার পৈত্রিক রাজ্য সীমানা মধ্যে থাকা কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে গেলো।

এ সময়ে সুযোগ বুঝে মীঙ্গলীঘ উপজাতির ইব্রাহীম সারুও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুললো। "শিশুকাল থেকেই সে আমার পিতার অধীনে কাজ করে আসছিল। এমন কি বেগের পদেও উন্নীত করা হয়েছিল তাকে। পরে কতক দুষ্কর্মের জন্য বার করে দেয়া হয় চাকুরী থেকে। সে এ সময়ে দখল করে নিলো অস্ফর দুর্গ। খুতবা পাঠ করলো সেখানে বৈশুঙ্ঘর মীর্জার নামে। শুরু করলো আমার সাথে শত্রুতাচারণ। তার বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রস্তুত হবার আদেশ দিলাম সেনাদের। রওনা হলাম সাবান মাসে। মাসের শেষাশেষি সেখানে পৌঁছে অবরোধ করলাম অস্ফর দুর্গ।"

বেগতিক দেখে ইব্রাহীম সারু সাহায্যের জন্য বৈশুজ্ঘর মীর্জার কাছে আবেদন করলেন। কিন্তু তাকে সাহায্য করবেন সে পরিস্থিতি তখন বৈশুজ্ঘর মীর্জার নেই। মোঙ্গল-প্রধানকে রুখতে ব্যস্ত তখন তিনি।

'চল্লিশ দিন ধরে অবরোধ চললো।' অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লো ইব্রাহীম সারুর। আর কোন উপায় নেই দেখে খাজা মৌলানা কাজীর মাধ্যমে বিনা-শর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠালেন বাবরের কাছে। শওয়াল মাসে (জুন, ১৪৯৫) গলায় তুণীর ওত রবারী ঝুলিয়ে দুর্গ থেকে বার হয়ে বাবরের সমুখে উপস্থিত হলেন। সমর্পণ করলেন দুর্গ।

অপরাধ মার্জনা করে আবার ইব্রাহীম সারুকে চাকুরীতে বহাল করলেন বাবর।

এ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বাবর এবার এগিয়ে গেলেন খুজন্দের দিকে। খুজন্দ দীর্ঘকাল তার পিতার শাসনাধীন ছিল। মৃত্যুকালে তিনি যে যুদ্ধে ব্রতী হন তার ফলে সুলতান আহমদ মীর্জা এটি দখল করে নেন। এবার সুযোগ বুঝে এ অঞ্চলটি দখল করার জন্য অভিযান করলেন বাবর। মীর মুঘলের পিতা আবদুল ওয়হাব শঘাওয়ল তখন এর শাসনকর্তা। বাবর যখন ইব্রাহীম সারুর বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ঠিক সে সময়ে শঘাওয়াল বৈশুজ্ঘর মীর্জার আধিপত্য স্বীকার করে নেন। কিন্তু বাবরকে সসৈন্যে উপস্থিত দেখে বিনা প্রতিরোধে তার কাছে দুর্গ সমর্পণ করলেন তিনি।

এ সময় মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খান শাহরুখিয়তে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন। খবর পেয়ে বাবর ভাবলেন "দুজনে যখন এতো কাছাকাছি হয়েছি, তখন তার সাথে দেখা করে তাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসা উচিত। তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ও জ্যেষ্ঠ ভাই পর্যায়ের। অতীত ঘটনাবলীর দরুন যদি তার মনে কোন ভুল ধারণা থেকে থাকে তবে তা দূর করে আসা দরকার। এই পদক্ষেপ বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় দিক থেকেই সুফলদায়ক হবে। যারা আমার এ প্রচেষ্টা চাক্ষুষ দেখবে অথবা পরে শুনবে সকলের মনেই তা প্রভাব বিস্তার করবে। আরো একটি বিশেষ লাভ হবে এর ফলে। তার দরবারের হালচাল সম্পর্কেও কিছুটা স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।"

"মনস্থির করে শাহরুখিয়র কাছে তার সাথে দেখা করার জন্য উপস্থিত হলাম। একটি বাগিচার মাঝখানে তোলা একটি শিবির মধ্যে তিনি বসেছিলেন। ভেতরেপৌঁছে নিচু হয়ে তিনবার কুর্ণিশ জানালাম পরিবর্তে, তিনি আসন

থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। এরপর পিছিয়ে গিয়ে আমি আবার একবার কুর্ণিশ জানালাম তাকে। খান কাছে ডাকলেন আমাকে। পাশে বসিয়ে স্নেহ ও সহৃদয়তার সার্বিক প্রকাশ ঘটালেন। এক কি দুদিন পরে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। যাত্রা করলাম অখসী ও অন্দিজানের দিকে।"

নিজের সম্পর্কে বড় মামার মনে উজ্জ্বল ধারণার সৃষ্টি করে বাবর যে তার বর্তমান পরিস্থিতিতে মোঙ্গল-প্রধানকে তার কল্যাণকামী ও সহায়ক রূপে পেতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্যেই এই সাক্ষাৎ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন তার বর্ণনা থেকেই এ কথা স্পষ্ট। হয়তো বিরাট কিছু প্রত্যাশাও করেছিলেন তার কাছ থেকে। তবে তার দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকার মৌখিক আশ্বাসের উর্ধে আর কিছু মোঙ্গল-প্রধানের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন কিনা সন্দেহ।

বড় মামার সঙ্গে দেখা করার পর অখসী এলেন বাবর। পিতার সমাধি সৌধে গিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। যাত্রা করলেন তারপর রাজধানী অন্দিজানের দিকে।

পথে জিগরক উপজাতির লোকদের কাছ থেকে কর আদায়ের কথা মনে পড়ে গেল তার। ফরঘান ও কাশগড়ের মাঝে থাকা পাহাড়ী এলাকায় বাস করতো এরা। 'প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার পরিবার। অনেক ঘোড়া আর ভেড়া আছে এদের। রয়েছে সাধারণ ষাঁড়ের বদলে কুটা নামের পাহাড়ী ষাঁড়। দুরারোহ পার্বত্য এলাকায় বাস করে বলে এরা কর দিতে চায় না। শক্তিশালী এক বাহিনী সঙ্গে দিয়ে কাশিম বেগকে পাঠালাম জিগরকদের বিরুদ্ধে। নির্দেশ দেয়া হলো তাদের কতক সম্পত্তি দখল করে নিয়ে আসার জন্য। সৈন্যদের দেয়ার মতো কিছু সম্বল অন্ততঃ পাওয়া যাবে তাহলে। গেল কাশিম বেগ। কুড়ি হাজার ভেড়া আর এক হাজার থেকে এক হাজার পাঁচশো ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলো সে। দিলাম বেঁটে সেগুলি সৈন্যদের ভেতর।'

ইব্রাহীম সারুর বিদ্রোহ দমন, খুজন্দ পুনর্দখল ও জিগরক উপজাতিদের কাছ থেকে কর আদায় পর পর এ তিন সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন বাবর। বার হলেন এবার আউরাটীপা দখলের জন্য।

"দীর্ঘকাল এ অঞ্চলটি (আমার পিতা) উমর শেখের দখলে ছিল। তার মৃত্যুর বছরে একে হারাই। (সুলতান আহমদ মীর্জা জয় করে নেন)। বৈশুঙ্গর মীর্জার প্রতিনিধি রূপে তার ছোট ভাই আলী মীর্জা এখন শাসন করে চলেছে এ

অঞ্চলটি। আমি এগিয়ে আসছি খবর পেয়ে একা একা মচ পার্বত্য এলাকায় পালিয়ে গেলো সুলতান আলী মীর্জা। আউরাটীপা রক্ষার দায় চাপিয়ে গেলো তার গৃহশিক্ষক শেখ জুনুন অরঘুনের উপর। খুজন্দ পার হয়ে যখন এগিয়ে চলেছি, তখন খলীফকে দূত হিসাবে পাঠালাম শেখ জুনুনের সাথে আলোচনার জন্য। কিন্তু সেই একগুয়ে লোকটা কোন সদুত্তর দেয়ার বদলে বন্দী করলো খলীফকে। আদেশ দিল প্রাণদণ্ডের। তবে, ভগবানের ইচ্ছা সে রকমটি নয়। পালিয়ে গেল খলীফ। প্রায় মাস দু-তিনেক পর আমার কাছে ফিরে এলো একদিন। হাজারো রকম দুঃখ দুর্দশা সয়ে, পায়ে হেঁটে একেবারে নগ্ন অবস্থায়। আমি এগিয়ে গেলাম। ঢুকলাম আউরাটীপায়। শীত ঘনিয়ে আসায় যা কিছু ফসল ও পশুখাদ্য ঘরে তুলে নিয়েছে অধিবাসীরা। তাই, কয়েকদিনের মধ্যেই অন্দিজান ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।"

"আমি সে অঞ্চল ছেড়ে চলে আসার পরে পরেই মাহমুদ খানের সেনারা আউরাটীপা আক্রমণ করলো। প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে অধিবাসীরা শহর সমর্পণে বাধ্য হলো। মুহম্মদ হুসেন কুরকানের উপর খান এখানকার শাসন ভার দিলেন। ৯০৮ হিজরী (১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত তিনিই শাসন করে চললেন এ অঞ্চল।"

আউরাটীপা উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যর্থ হলেও এজন্য হতাশ হলেন না বাবর। সব প্রচেষ্টাই কি কখনো সফল হয় মানুষের? এর আগে পরপর যে তিনটি সাফল্য তিনি লাভ করেছেন তাই বা কম কিসে! সুতরাং, মনের সব গ্লানি মুছে ফেলে, নিজের শক্তিকে সুসংহত করার দিকে মন দিলেন তিনি। নিজের যতটুকু যা সহায় সম্বল আছে তাকে গুছিয়ে নিতে, সুষ্ঠুভাবে তাকে কাজে লাগাতে তৎপর হলেন। সুরু করলেন সৈন্য সংগ্রহ। এই ব্যর্থতা তাকে সচেতন করে দিল, নিজের শক্তি ও যোগ্যতা আরো বৃদ্ধি করতে না পারলে তার ভবিষ্যৎ সপ্ন সফল হবার নয়। আর তা করতে হবে নিজের যতটুকু যা সহায়-সম্বল আছে তা দিয়েই।

এদিকে মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খানকে কান-বাঈয়ের যুদ্ধে দারুন ভাবে পরাস্ত করে সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও শত্রুমুক্ত হতে পারলেন না বৈশুঙ্ঘর মীর্জা। অপর এক পরাক্রান্ত শত্রুর মুখোমুখি হতে হলো তাকে এবার। ইনি খুরাসানের সুলতান হুসেন মীর্জা বঈকরা। তৈমুর লঙের বড় ছেলের বংশধর। তার ঘরানার রাজাদের মধ্যে তিনিই হলেন সব থেকে বিক্রমশালী। বিরাট রাজ্য। হীরাট

তার রাজধানী। পড়শীদের খরচে নিজ রাজ্যের আয়তন বাড়াতে অশেষ ধুরন্ধর তিনি। যেই দেখলেন, বিরাট এক যুদ্ধে জয়ী হলেও সুলতান বৈশুঙ্ঘর মীর্জা বেশ বিপাকের মধ্যেই আছেন অমনি তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে হিসার অভিযান করলেন। শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কোন যুদ্ধ না করে হিসারের শাসনকর্তা সুলতান মসুদ মীর্জা সমরকন্দ পালিয়ে এলেন ভাই বৈশুঙ্ঘর মীর্জার কাছে। মসুদ মীর্জা পালিয়ে আসার দরুন দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল বদকশান জুড়ে। কিন্তু দমে গেলেন না বৈশুঙ্ঘর মীর্জা। শত্রুসেনাকে প্রতিহত করার জন্য ওয়ালীকে পাঠালেন খুটলান। আর বাকী চঘানীয়ানী, মামুদ বরলস ও সুলতান আহমদকে পাঠালেন বদকশানের রাজধানী হিসার।

হিসার দুর্গ অবরোধ করলেন সুলতান হুসেন মীর্জা বঙ্গকরা। বেশ কয়েক মাস ধরে উভয় সৈন্যদলের মধ্যে থেকে থেকে সংঘর্ষ ঘটলো। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও স্থানীয় বাহিনীকে কাবু করতে পারলেন না তিনি। শেষে, জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে শান্তির প্রস্তাব দিলেন। উভয় পক্ষের আলোচনা বৈঠকে শান্তির সর্ত নির্ধারিত হলো। স্থাপিত হলো বৈবাহিক সম্পর্ক। হুসেন মীর্জা বঙ্গকরার ছেলে হায়দার মীর্জার সঙ্গে বিয়ে হলো সুলতান বৈশুঙ্ঘর মীর্জার বোন, মাহমুদ মীর্জার বড় মেয়ে বেগা বেগমের। এ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সুলতান হুসেন মীর্জা অবরোধ তুলে নিলেন। ফিরে গেলেন হীরাট। সমরকন্দের এক ইঞ্চি জমিও তার পক্ষে দখল করা সম্ভব হলো না এ অভিযানে।

এ বছরের রমজান মাসে তরখানী আমীররা বিদ্রোহ করে বসলো সমরকন্দে। তাদের ক্ষোভ, সুলতান বৈশুঙ্ঘর মীর্জা হিসারের অধিবাসীদের অসংগতভাবে বেশি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন, অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাকে হটিয়ে দিয়ে তাই এবার তারা তার ছোট ভাই আলী মীর্জাকে সমরকন্দের সিংহাসনে বসাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিদ্রোহীদের অন্যতম দরবেশ মুহম্মদ আলী মীর্জাকে কুরশী থেকে সমরকন্দ নিয়ে এলেন। সুলতান বলে ঘোষণা করা হলো তাকে। নতুন বাগে গিয়ে ঘেরাও ও বন্দী করা হলো বৈশুঙ্ঘর মীর্জাকে। নিয়ে যাওয়া হলো দুর্গে। সেখান থেকে তাকে স্থানান্তর করা হলো গুক সরাই। সঙ্গে ছিলেন আলী মীর্জাও। কেননা, এই গুক-সরাই হলো এক দিকে তৈমুর বংশীয় রাজকুমারদের হত্যা-মঞ্চ, অন্যদিকে অভিষেক স্থান।

হত্যার আগেই কৌশল করে পালিয়ে গেলেন বৈশুঙ্ঘর মীর্জা। আশ্রয় নিলেন খাজাকি খাজার আবাসে। সন্ধান পেয়ে বিরাট দলবল নিয়ে সেখানে হাজির

হলেন তরখানীরা। বৈশুঙ্ঘর মীর্জাকে তাদের হাতে সমর্পণ করার দাবী জানালেন। সে দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করলেন খাজাকি খাজা। তার মান সম্মান প্রতিপত্তি তাদের তুলনায় অনেক বেশি বলে তরখানীরা তার কাছ থেকে বৈশুঙ্ঘর মীর্জাকে ছিনিয়ে নিতে সাহসী হলো না।

দিন কয়েকের মধ্যেই খাজা আবুল মকারম, আহমদ হাজী বেগ প্রভৃতি আমীররা, সেনাদল ও শহরবাসীরা পালটা বিদ্রোহ করে বসলো তরখানীদের বিরুদ্ধে। খাজাকি খাজার আবাস থেকে তারা বৈশুঙ্ঘর মীর্জাকে নিয়ে গেলো। অবরোধ করলো দুর্গ মধ্যে থাকা আলী মীর্জা ও তরখানী বেগদের। বেসামাল হয়ে তরখানী বেগেরা যে যেদিকে পারলো পলিয়ে গা ঢাকা দিল। আলী মীর্জাকে ছেড়ে দিয়ে গেল তার নিজের ভাগ্যের উপরে। তরখানী বিদ্রোহীদের অন্যতম নায়ক মুহম্মদ মজীদ তরখান পালিয়ে বুখারায় গেলেন। মুহম্মদ তরখান ও আলী মীর্জা বন্দী হলেন বৈশুঙ্ঘর মীর্জার সমর্থকদের হাতে।

আলী মীর্জাকে অন্ধ করে দেবার আদেশ দেয়া হলো। নিয়ে যাওয়া হলো সেজন্য গুক-সরাইয়ে। তাতানো শলাকা টেনে দেয়া হলো দু-চোখে। যে শল্য-বিদের উপর এ কাজের ভার পড়েছিল তিনি আলী মীর্জার সমর্থক বলেই হোক বা তার প্রতি অনুকম্পা বশতঃই হোক, কাজটি এমন কায়দায় করলেন যে আলী মীর্জা তার দৃষ্টিশক্তি খোয়ালেন না। সুযোগ মতো পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন খাজা য়াহিয়ার কাছে। দিন কয়েক পর বুখারায় গিয়ে যোগ দিলেন তরখানী বেগদের সাথে।

এবার সমরকন্দে সুরু হয়ে গেল জনযুদ্ধ।

আলী মীর্জার পালিয়ে যাবার খবর পেয়ে তাকে ও তার সমর্থকদের দমন করার জন্য বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে বৈশুঙ্ঘর মীর্জা বুখারায় ছুটলেন। আলী মীর্জা ও তার সমর্থকরাও চুপ রইলেন না। প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধে বিরাট ভাবে পরাজয় ঘটলো বৈশুঙ্ঘর মীর্জার। বাধ্য হয়ে পিছু হটে তিনি রাজ-ধানী সমরকন্দে ফিরে এলেন।

বালক বাবর সমরকন্দের সিংহাসনে বসার সোনালী স্বপ্ন নিয়ে এতকাল দূর থেকে এখানকার ঘটনাপ্রবাহের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলছিলেন। উত্তাল জনযুদ্ধ ও আলী মীর্জার হাতে সুলতান বৈশুঙ্ঘর মীর্জার শোচনীয় পরাজয় তাকে উৎসাহে চঞ্চল করে তুললো। ভাবলেন, সমরকন্দ জয়ের এমন অমৃত-সুযোগ জীবনে কখনো আর আসবে না হয়তো।

কতোই বা বয়স তার তখন! সবে তেরো পেরিয়ে চৌদ্দয় পা দিয়েছেন। শক্তিতে, যোগ্যতায় না তিনি আলী মীর্জার সমকক্ষ, না বৈশুঙ্ঘর মীর্জার। যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু! বলতে গেলে প্রকৃত যুদ্ধ কাকে বলে তাই জানেন না এখন পর্যন্ত। তবু এ সুযোগ নষ্ট করতে চাইলেন না তিনি। দুঃসাহসীর মতো বেরিয়ে পড়লেন সমরকন্দ অভিযানে (জুন, ১৪৯৬)।

বৈশুঙ্ঘর মীর্জার বড় ভাই মসুদ মীর্জাও পরম সুযোগ দেখে সিংহাসনের উপর তার হক দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সসৈন্যে সমরকন্দের দিকে যাত্রা করলেন এ সময়ে। এছাড়া আলী মীর্জা ও তার সমর্থকরা তো আছেনই।

তিনদিক থেকে তিনজনের সেনাবাহিনী অবরোধ করলো সমরকন্দ। "তিন থেকে চারমাস এ ভাবে সমরকন্দ তিনদিক থেকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রইলো। আলী মীর্জার কাছ থেকে খাজা য়াহিয়া সন্ধি ও জোটবাঁধার প্রস্তাব নিয়ে এসময়ে এলো আমার কাছে। অতি নিপুণভাবে সব এগিয়ে নিয়ে গেলো সে। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা দুজনে বৈঠকের জন্য সম্মত হলাম। এজন্য সেনাবাহিনী নিয়ে আমি তিন-চার ফারসঙ্গ এগিয়ে গেলাম সোগধ থেকে এগিয়ে সমরকন্দের দুই কি তিন গজ চের-ই (আট মাইলের মতো) দূরে উপস্থিত হলাম। উলটোদিক থেকে সেও তার সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে এলো। তারপর চার-পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে এলো আলী মীর্জা। আমিও এগিয়ে গেলাম সমান সংখ্যার সঙ্গী নিয়ে। কোহিক নদীর মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে বসে মোলাকাত হলো আমাদের। অল্প কিছুক্ষণ সৌজন্যভরা আলাপ-আলোচনার পর সে তার দিকে, আমি আমার দিকে ফিরে এলাম।

"সুলতান আলী মীর্জার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের পর শীতঋতু আসন্ন দেখে ও সমরকন্দে ভীষণ খাদ্যাভাব লক্ষ্য করে আমি অন্দিজান ফিরে এলাম। সুলতান আলী মীর্জা চলে গেল বুখারায়। সুলতান মসুদ মীর্জা শেখ আবদুল্লা বরলাসের কন্যার গভীর আকর্ষণে পড়ে, নিজের পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে হিসার ফিরে গেলো। অথচ তার সমরকন্দ আসার এটিই কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না।

"আলী মীর্জার সঙ্গে আমার বৈঠকে স্থির হয়েছিল, গ্রীষ্ম ঋতু এলে সে বুখারা থেকে, আমি অন্দিজান থেকে গিয়ে সমরকন্দ অবরোধ করব।"

।। চার ।।

অন্দিজান ফিরে সমরকন্দ অধিকারের স্বপ্ন সার্থক করার জন্য সারা শীতকাল সমরায়োজনে ব্যস্ত রইলেন বাবর। চতুর কূটনীতিকের মতোই তার এই সমরায়োজনের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখলেন সকলের কাছে।

শেষ হলো আয়োজন। খবর এলো, জোটের শরিক সুলতান আলী মীর্জা চুক্তি মতো সেনাবাহিনী নিয়ে বুখারা থেকে যাত্রা শুরু করছেন। অন্দিজান থেকে তিনিও বেড়িয়ে পড়লেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস তখন। চললেন সমরকন্দের দিকে। রাজধানীর শাসন ও প্রতিরক্ষা-দায়িত্ব দিয়ে গেলেন আলী দোস্ত তঘাই ও ঔজুন হাসানের উপর। মন তার রঙীন স্বপ্ন আর সাহসে ভরপুর। চোখের সামনে নাচছে তৈমুর লঙ আর তার দিগবিজয় দৃশ্য। হাতছানি দিয়ে ডাকছে সমরকন্দের সিংহাসন। এ সিংহাসনে বসতেই হবে তাকে।

আলী মীর্জা এগিয়ে আসছে সেনানী নিয়ে। সমরকন্দের আমীর ওমরাহদের সহযোগিতায় প্রতিরোধের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত হলেন বৈশুঙ্ঘর মীর্জা। শত্রুপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য মেহদী সুলতানের নেতৃত্বে এগিয়ে চললো তার সেনারা। আলী মীর্জাও প্রতিপক্ষকে চূর্ণ করার জন্য আবদুল করিম উশরীতের নায়কত্বে তার এক বাহিনীকে পাঠালেন। কুফীনে এসে মুখোমুখি হলো দুই বিরোধী সমর নায়ক। সংঘর্ষ শুরু হলো। যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলো আলী মীর্জার বাহিনী। তার উজবেগী সৈন্যরা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল উজবেগ প্রধান শইবানি খানের কাছে।

অল্প কয়েকদিন পরেই আরেক দল সৈন্য নিয়ে বৈশুঙ্ঘর মীর্জা সর-ই-পুলে অবস্থান নিলেন। অন্যদিক থেকে আলী মীর্জা এগিয়ে এলেন খাজা কারজুনের দিকে। তার এগিয়ে আসার খবর সমরকন্দ এসে পৌঁছল। আউশের খাজা মুনীরের প্ররোচনায় ওয়েইস লাঘরী, মুহম্মদ বাকির, কাশিম দুলদাই ও আরো অনেককে সঙ্গে নিয়ে খাজা আবুল মকারম আলী মীর্জার মতলব বানচাল করতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সে উদ্যম ব্যর্থ হলো তাদের। নিরাশ হয়ে সুলতান বৈশুঙ্ঘর মীর্জার ছাউনিতে ফিরে এলেন সকলে। দু ভাই, আলী মীর্জা ও বৈশুঙ্ঘর মীর্জা এবার খোলা আকাশের নিচে পরস্পরের মুখোমুখি হলেন।

য়ার ইলাক পৌঁছে এ খবর জানতে পেলেন বাবর। সাথে সাথে খাজা তুলুন মুঘলের নেতৃত্বে দু-তিনশো সুদক্ষ সেনার এক আগুয়া বাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন।

নির্দেশ দিলেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে গিয়ে শত্রু সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। তারা যখন কাছাকাছি হলো, সে সময়ের মধ্যে বৈশুঙ্ঘর মীর্জা বাবরের এগিয়ে আসার খবর পেয়ে গেছেন। এ ঘটনা বেসামাল করে তুললো তাকে। তিনি ভাবতেই পারেননি, বাবরও এ সময়ে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ অভিযানে আসবে। ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে, তাড়াতাড়ি শিবির তুলে নিয়ে বিশৃঙ্খল ভাবে পশ্চাৎ অপসরণ শুরু করলেন তিনি। একেবারে সময়মতোই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলতে হবে। তবু বাবরের আগুয়া বাহিনী "সে রাতেই তাদের প্রান্তিক বাহিনীকে ধরে ফেললো। তীরের আঘাতে তাদের অনেকে প্রাণ হারালো। বহু লোককে বন্দী করা হলো। লুটে নেয়া হলো প্রচুর দ্রব্যসম্ভার।"

এ অবশ্যই এক বিরাট সাফল্য। শত্রুপক্ষের মনোবল এভাবে অনেক দুর্বল করে দিতে পেরেছেন তিনি। উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বাবর। দুদিন পরে আলী মীর্জা সহ তিনি উপস্থিত হলেন শিরাজ শহরে। এ শহর তখন কাশিম বেগ দুলদাইয়ের অধীনে। যাকে তিনি এর দায়িত্বে রেখে গিয়েছিলেন তিনি বেশিক্ষণ বাবরের সেনাদলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই আত্মসমর্পণ করতে হলো। ইব্রাহীম সারুর উপর শহর ও দুর্গের ভার অর্পণ করলেন বাবর।

পরদিন সকালে ঈদ-উল-ফিতরের উপবাস উদযাপন করে সমরকন্দের দিকে অগ্রসর হলেন বাবর। আব-ই-য়ার নদীর অপর তীরে গিয়ে অবস্থান নিলেন। শত্রু বাহিনীকে দোরগোড়ায় দেখে আতঙ্ক খেলে গেল সমরকন্দবাসীদের মনে। বৈশুঙ্ঘর মীর্জার পশ্চাৎ অপসরণ ও শিরাজ শহরের পতন রোধে ব্যর্থতা তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে তখন। বৈশুঙ্ঘর মীর্জার উপর আস্থা হারিয়ে কাশিম দুলদাই, ওয়েইস লাঘরী, মুহম্মদ শিঘলের নাতি হাসান ও মুহম্মদ ওয়েইস তিন-চারশো সঙ্গী নিয়ে বাবরের দলে এসে যোগ দিলেন।

এই দলত্যাগীদের নিজের বাহিনীতে নিতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না বাবর। এরা ছিলেন অনিশ্চিত চরিত্রের। স্থূল ও লোভী প্রকৃতির। শুধু এদের শক্তিকে শত্রুর বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্যই দলে নিলেন তিনি। এরা যে কোন না কোন রকম গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে এ আশঙ্কা শুরু থেকেই তার ছিল। এক সময়ে তা সত্য হয়েও দেখা দিল। করা-বুলাকে তিনি যখন ছাউনী ফেললেন তখন এদের অনেককেই বন্দী করে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হলো। অভিযোগ উঠলো এরা গ্রামের মধ্য দিয়ে আসার বেলা গ্রামবাসীদের সঙ্গে অকথ্য

দুর্ব্যবহার করেছে। যাতে তারা সংযত আচরণ করে সেজন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু-তিনজন অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দেয়া হলো।

'করা-বুলাক থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে জরাফশান নদী পার হলাম। থামলাম 'য়াম'-এর কাছে। এদিনই শহরের খিয়াবান বা রঙ্গভূমিতে বৈশুঙ্ঘর মীর্জার একদল সেনার সাথে আমার প্রধান বেগদের মধ্যে কতকের সংঘর্ষ হলো। ঘাড়ে বর্শার আঘাত পেয়ে সুলতান আহমদ তম্বল জখম হলেন। খাজাকী মোল্লা-ই-সদর (প্রধান বিচারক) ঘাড়ে তীর বেঁধার দরুন সাথে সাথে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ করলেন। সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আমার পিতা খুব শ্রদ্ধা করতেন তাকে। নিযুক্ত করেছিলেন সীলমোহর রক্ষকের পদে। পণ্ডিত লোক ছিলেন, ছিল ভাষার উপর অশেষ দখল। বাজপাখি পালন, তার সাহায্যে শিকার এবং যাদুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

'যখন আমরা ছাউনি করে য়াম শহরের কাছে আছি এক দল লোক শহর থেকে ছাউনি মহল্লায় এলো। শুরু করে দিলো মালপত্র নিয়ে আসা যাওয়া, কেনাবেচা। এদের মধ্যে সাধারণ ও বণিক দুই-ই ছিল। বৈকালিক নমাজের সময় একদিন হঠাৎ খুব সোরগোল জাগলো। লুট করে নেয়া হলো ওই সব মুসলমানদের পসরা। আমি আদেশ দিলাম সৈন্যরা কেউ যেন তাদের কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ না করে। আমার বাহিনী মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলা বলবৎ ছিল যে পরের দিন প্রথম প্রহর পার হবার আগেই সম্পত্তির মালিকেরা তাদের সব কিছু ফেরত পেয়ে গেল। এক খণ্ড ফিতে কি একটা ভাঙা সূচও পড়ে রইলো না।'

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিরাজিত শৃঙ্খলা নিয়ে বাবর এখানে যে গৌরব প্রকাশ করেছেন তাকে রঙ চড়ানো বলেই মনে হয়। সমরকন্দ বিজয়ের পর সেনাবাহিনী যেরূপ ব্যাপক হারে তাকে ত্যাগ করে দেশে ফিরে যায় তা থেকে তারা যে বাবরের যথেষ্ট অনুগত ছিল ও যথেষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল তা মেনে নেয়া কঠিন। এক্ষেত্রে বাবরের বিবরণ নির্ভুল হলে বলতে হবে যে এ শৃঙ্খলা ছিল নিতান্তই সাময়িক ও উপর থেকে চাপানো। সৈন্যরা অনিচ্ছার সঙ্গে তাকে মেনে চলছিল শুধু।

অবশ্য করাবুলাকে গ্রামবাসীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য ও য়ামে ব্যবসায়ীদের পসরা লুঠের ক্ষেত্রে বাবর যে পদক্ষেপ নেন তা থেকে সূচিত হয় যে তিনি তার সৈন্যবাহিনী ও সমরকন্দ অধিবাসী উভয়ের কাছেই নিজেকে একজন শৃঙ্খলা-অনুরাগী আদর্শ শাসক রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসুক ছিলেন। সমরকন্দ জয়ের পরও তিনি যে নীতির অনুসরণ করেন তা থেকেও এর সমর্থন মেলে।

গ্রাম থেকে এগিয়ে গিয়ে এবার খান-য়ূর্তীতে ছাউনি ফেলা হল। এখান থেকে সমরকন্দ শহর মাত্র তিন ক্রোশ দূরে। প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিন এখানে রইলেন বাবর। শহর অবরোধ করার জন্য আগুয়া সেনাদল পাঠানো হলো এখান থেকে। শহরের রঙ্গভূমিতে অনেকবার তীব্র সংঘর্ষ ঘটলো দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে। বাবরের সেনারা কিছুতেই প্রতিরোধ ভেদ করে এগিয়ে যেতে পারলো না।

বাবরকে ফাঁদে ফেলে বন্দী করার জন্য শহরবাসীরা এ সময় ফন্দী আঁটলো। খান-য়ূর্তীতে তার কাছে তাদের এক প্রতিনিধিকে পাঠালো তারা। জানানো হলো, যদি তিনি অমুক দিন রাতে শহরের নিকটবর্তী 'প্রেমিক গুহা'র কাছে উপস্থিত হন তবে সেখানে তার হাতে দুর্গের চাবি সমর্পণ করবেন তারা।

তাদের কথায় বিশ্বাস করলেন বাবর। সেই বিশেষ রাতে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলেন সেখানে। সঙ্গে নিলেন বাছাই করা জনকয়েক ঘোড়সওয়ার ও পদাতিককে। মঘাক সেতু ধরে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি পৌছে সঙ্গী সেনাদের একাংশকে পাঠালেন প্রেমিক গুহায়। তাদের মতলব বুঝে ওঠার আগেই চার-পাঁচজন পদাতিক বন্দী হলো। এরা সকলেই বাবরের বিশ্বাসভাজন ও অতি কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেন এদের মধ্যে বাবরের আশৈশব ভৃত্য হাজী। ছিলেন মুহম্মদ কুন্দুর সংঘক। শহরবাসীরা হত্যা করলো এদের।

এ আঘাতে দমে গেলেন না বাবর। সমরকন্দ জয়ের প্রতিজ্ঞায় অনমনীয় রইলেন তিনি। অব্যাহত রাখলেন সামরিক তৎপরতা। কয়েক দিনের মধ্যেই এমন একটি ঘটনা ঘটলো যা তার আত্মবিশ্বাস ও মনোবলকে আরো বাড়িয়ে দিলো। সমরকন্দ জয়ের স্বপ্ন আর আকাশকুসুম কল্পনা বলে মনে হলো না তার কাছে। একদিন তার ছাউনিতে এসে উপস্থিত হলো সমরকন্দ রাজ্যের অসংখ্য শহরবাসী ও ব্যবসায়ী। বাবরের ভাষায় 'ছাউনি যেন মহানগরে পরিণত হলো। শহরে যতো যা সামগ্রী মেলে সব তখন ছাউনিতে উপস্থিত। এ সময়ে আমার দখলে সারা দেশ, সব দুর্গ, সব মালভূমি ও নিম্নাঞ্চল আসতে শুরু করেছে।' বাকি শুধু সমরকন্দ শহর।

বাবর এবার এগিয়ে গেলেন আউরগুত দুর্গের দিকে। 'আউরগুত দুর্গে একটি ছোট সৈন্যদল ছিল। এটি শবদার পাহাড়ের গোড়ায়। এজন্য আমি য়ূর্তী ছেড়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে বাধ্য হলাম। দুর্গ রক্ষা করতে না পেরে তারা খাজা কাজীর মধ্যস্থতার শরণ নিলো। আত্ম-সমর্পণ করলো আমার কাছে।'

এই সাফল্যের পর পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি এগোলেন সমরকন্দ শহর ও দুর্গ দখলের জন্য।

"এবার আমরা ছাউনি ফেললাম কুলূব-এর তৃণাঞ্চলে, বাঘ-ই-ময়দানের পিছনে। এ ঘটনায় সমরকন্দের সেনা ও নাগরিকেরা মুহম্মদ চপ সেতুর কাছে বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হলো। আক্রমণ করে বসলো আমাদের। আমার সৈন্যরা তখন বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। তারা প্রতিরোধের সময় পেল না। তার আগেই শত্রুরা বাবা কুলীকে ঘোড়া থেকে টেনে নামালো ও শহর মধ্যে ধরে নিয়ে গেল।

"কয়েকদিন পর আমরা সরে গিয়ে কুলূব-এর এক পাশে কোহিক পাহাড়ে ছাউনি গাড়লাম। সেদিনই সমরকন্দ থেকে এই শিবিরে এসে সৈয়দ য়ুসুফ আমার সাথে দেখা করলো, আমার অধীনে চাকুরি নিল। আমাদের এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে চলে যেতে দেখে সমরকন্দের লোকেরা ভাবলো, বোধহয় আমি ফিরে চলে যাচ্ছি। তারা বিপুল-সংখ্যায় আমাদের দিকে তেড়ে এলো। শহরবাসী ও সৈন্য, দুই-ই। মীর্জা সেতু পর্যন্ত এগিয়ে এলো তারা। এলো শেখজাদার ফটক দিয়ে বেরিয়ে মুহম্মদ চপ সেতু পর্যন্ত। যতো ঘোড়-সওয়ার তখন ছাউনিতে হাজির ছিল সবাইকে অস্ত্র নিয়ে অবিলম্বে আক্রমণ করার আদেশ দেয়া হলো দুদিক থেকে। মীর্জা সেতু আর মুহম্মদ চপ সেতুর দিক থেকে। ঈশ্বর আমাদের অগ্রগতিতে সহায়ক হলেন, শত্রুরা হেরে গেল। অনেক বেগ ও ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বন্দী হলো। এদের মধ্যে ছিল হাফিজ দুলদাইয়ের ছেলে মুহম্মদ মিশকিন। ছিল হাসান নবীরের ছোট ভাই মুহম্মদ কাশিম নবীর। শত্রুপক্ষের অনেক বিশিষ্ট কর্মচারী ও যোদ্ধাকেও বন্দী করে আনা হলো। কতক সাধারণ শ্রেণীর শহরবাসীও ধরা পড়লো। দৈহিক নির্যাতন সহ তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়া হলো। এ ভাবে প্রতিশোধ নেয়া হলো প্রেমিক গুহার কাছে পদাতিক সৈন্যদের হত্যা করার।

"সমরকন্দের অধিবাসীদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এ সময়ের পর থেকে কখনো আর তারা হঠাৎ-আক্রমণের কোন চেষ্টা করেনি। ঘটনাপ্রবাহ এমন এক গতি নিল যে আমাদের বাহিনী একেবারে পরিখার কিনার পর্যন্ত এগিয়ে গেল। প্রাকারের প্রায় কোল থেকে কতক বান্দা ও বাঁদীদের ধরে নিয়ে এলো।

"সূর্য তুলারাশিতে প্রবেশ করলো। শীত ক্রমেই তীব্র হয়ে আসছে। বেগদের ডেকে এক পরামর্শ সভা বসালাম। একমত হলাম, শহরবাসীরা এখন বেশ

দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে এ জায়গাটিকে খুব সম্ভব অল্পদিনের মধ্যেই দখল করে নিতে পারবো। তবে, একেবারে খোলামেলা এলাকায় শিবির করে থাকার দরুন অশেষ অসুবিধার মধ্যে রয়েছি আমরা এখন। সহরের সম্মুখ থেকে বাহিনীকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত এজন্য। কাছাকাছি কোন দুর্গে শীতের আবাস তৈরি করা দরকার। তারপর বাহিনীকে ধীরে ধীরে সেখানে সরিয়ে নেয়া যাবে। এভাবে এগোলে কোন রকম বিশৃঙ্খলার মধ্যে না পড়ে, সুষ্ঠুভাবে সব কিছু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আমরা। খাজা দীদার দুর্গটিকে এ দিক থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হলো। অতএব যেখানে আস্থান নিয়েছি সেখান থেকে আমরা সরে গেলাম। খাজা দীদারের সামনে এক তৃণ-ভূমিতে আশ্রয় নিলাম। দুর্গ পরিদর্শন করে আবাস ও কুটিরাদি তৈরির জন্য স্থান নির্বাচন করা হলো। শ্রমিক ও পরিদর্শকদের উপর কাজের ভার দিয়ে শিবিরে ফিরে এলাম। শীতের আবাস তৈরি হতে যে কদিন সময় লাগলো সে পর্যন্ত ওই তৃণ ভূমিতেই কাটিয়ে দিলাম।

"ইতিমধ্যে বৈশুঙ্ঘর মীর্জা বার বার তুর্কীস্তানে দূত পাঠিয়ে চলছিল শইবানি খানের কাছে। সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়ে চলছিল।

"এদিকে, দুর্গ মধ্যে আবাস গড়া যেই শেষ হলো আমরা গিয়ে আশ্রয় নিলাম সেখানে।

"ঠিক পরদিনই শহবানি খান আমার সেনাছাউনির কাছে এসে উপস্থিত হলো। তুর্কীস্তান থেকে সে খুব দ্রুতগতিতে সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আমার বাহিনী তখন একরকম বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। কতক চলে গেছে খাজা রবাটী, কতক কবুদ, কতক বা শিরাজ শহরে শীত কাটাবার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য। এ অবস্থায় পড়ে একটুও দমে গেলাম না আমি। যারা উপস্থিত ছিল তাদের সারিবদ্ধ করলাম। গেলাম এগিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য।"

শইবানি খানের পরিকল্পনা ছিল তিনি অতর্কিতভাবে বাবরের অপ্রস্তুত সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তছনছ করে দেবেন। কিন্তু পৌছে দেখলেন বাবর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তার সৈন্যবলও অনেক বেশি। তারা ইতিমধ্যে দুর্গ মধ্যে আস্থান নিতে পেরে তার উজবেগ সেনাবাহিনীর তুলনায় অনেক সুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যেও রয়েছে। দেখে নিরাশ হলেন শইবানি খান। আক্রমণ পরিকল্পনা ত্যাগ করে পিছু হটে গেলেন। চলে গেলেন বৈশুঙ্ঘর মীর্জার কাছে সমরকন্দে।

বৈশুজ্ঘর মীর্জা খুশী হতে পারলেন না শইবানি খানের এ আচরণে। তার দুর্ধর্ষ উজবেগ বাহিনীর কাছ থেকে তিনি কার্যকর সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছিলেন। ক্ষুণ্ণ হয়ে শইবানি খানকে তিনি উপযুক্ত ও আন্তরিক আদর অভ্যর্থনা করলেন না। দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ সমরকন্দে তিনি বোধহয় শইবানি খানের সেনাদলকে উপযুক্ত খাদ্য জোগান দেবার মতো অবস্থার মধ্যেও ছিলেন না। এ পরিস্থিতিতে তার পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয় দেখে শইবানি খানও সব অপমান ও অবহেলা নীরবে সহ্য করে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ভারাক্রান্ত মনে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন।

"সাতমাস ধরে বৈশুজ্ঘর মীর্জা অবরোধ প্রতিহত করে চলেছেন। তার শেষ ভরসাস্থল ছিল এই সাহায্য। এতেও নিরাশ হয়ে ভেঙে পড়লেন তিনি। উপোসী ও জীর্ণ পোষাক পরা দু-তিনশো হতভাগ্যকে নিয়ে কুন্দুজ যাত্রা করলেন খুসরাউ শাহের কাছে আশ্রয় নেবার জন্য।"

তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ, স্বপ্নের নগরী সমরকন্দ এবার সত্যিই বাবরের হাতের মুঠোয় এলো।

"বৈশুজ্ঘর মীর্জা সমরকন্দ ছেড়ে পালাতে না পালাতেই সে ঘটনার কথা জানতে পেলাম। সাথে সাথে ঘোড়ায় চেপে খাজা দীদার (দুর্গ) থেকে বেরিয়ে পড়লাম সমরকন্দের দিকে। পথে দেখা হলো সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিক ও বেগদের সাথে। তাদের পিছু পিছু সেখানকার তরুণ অশ্বারোহীর দল। তারা সবাই আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে এসেছে। দুর্গের দিকে এগিয়ে চললাম আমি। বাগিচা প্রাসাদ বা 'বুস্তান সরাই'-এ গিয়ে উঠলাম। সমরকন্দ শহর ও রাজ্যের অধিকার পেয়ে গেলাম ভগবানের করুণায়।

"সারা পৃথিবীতে সমরকন্দের মতো এমন অপরূপ পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত শহর খুব কমই আছে।"

॥ পাঁচ ॥

আকাঙ্খার নগরী, স্বপ্নের নগরী সমরকন্দের তখতে তো বসলেন পনেরো বছরের বালক বাবর। কিন্তু রাজ্য চালাবেন কী করে? সৈন্যদেরই বা পুষবেন কী দিয়ে? রাজকোষ যে শূন্য।

যদি তিনি তৈমুর কিংবা চেঙিসের মতো নির্বিচারে লুণ্ঠন চালাতে পারতেন, নির্বিকার থাকতে পারতেন প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি, তবে হয়তো এ তখত কণ্টক-আসন হয়ে উঠতো না। তার দুর্বল কাঁধে পাহাড়ের মতো বিরাট বোঝা হয়ে দেখা দিত না এ রাজ্য, এ বিজয়। কিন্তু বাবর যে চান এক আদর্শ দিগ-বিজয়ী সম্রাট হতে। এক গৌরবজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে।

তাই, স্থানীয় আমীর-ওমরাহেরা পূর্ব-আমল থেকে যে সব সুযোগ-সুবিধা, অনুগ্রহ লাভ করে আসছিলেন তা বজায় রাখলেন তিনি। আপন রাজ্য ফরঘান থেকে যারা এ অভিযানে তার সঙ্গী হয়েছেন তাদেরও যোগ্যতা ও মর্যাদ অনুসারে পদোন্নতি ঘটালেন, পুরস্কৃত করলেন। কিন্তু কি বেগ বা আমীর, কি সাধারণ সৈনিক, কেউই এতে সন্তুষ্ট হলো না! তারা দীর্ঘ সাতমাস ধরে নানা ক্লেশ স্বীকার করে এ রাজ্য জয়ে তাকে সাহায্য করেছে। কিন্তু সে কষ্টের তুলনায় কী পেল তারা? অন্য কোন রাজার সঙ্গী হলে লুটের মাল থেকেই এ কষ্টের বহুগুণ উশুল করে নিতে পারতো তারা। অথচ বাবর তা হতে দেয়নি। সমরকন্দ শহর বাদে অবশিষ্ট রাজ্য তার বা সুলতান আলী মীর্জার সঙ্গে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছে। তাই সেনাদের সে অঞ্চল লুট করতে দেয়া হয় নি। সমরকন্দ শহরের দখল নেবার পর প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা লুটপাট হলেও পরে বাবরের আদেশে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। সুতরাং কারো ভাগেই বিশেষ কিছু লুটের মাল জোটেনি। সমরকন্দ রাজ্যের অতুল সম্পদে ভাগ বসাতে না পেরে, কষ্ট, পরিশ্রম ও সাফল্যের প্রতিদান প্রথামতো না পেয়ে সেনা, আমীর-ওমরাহ সকলেই অসন্তুষ্ট। বাবরের প্রতি না তাকিয়ে তারা তাই একে একে দেশে ফিরে যেতে সুরু করলে।

বাবর পড়লেন অসহায় অবস্থার মধ্যে। সৈন্যেরা চলে গেলে, আমীর ওমরাহরা চলে গেলে কাদের জোরে তিনি নতুন জয় করা রাজ্য চালাবেন। আবার বিজিত রাজ্যের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখেও তিনি অভিভূত। সুলতান মাহমুদ মীর্জার মৃত্যুর পর থেকে, বিশেষ করে গত দু বছর ধরে যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও সৈন্য চলাচলের দরুণ ঠিকভাবে চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্য হতে

পারেনি। জনসাধারণ নিদারুণ অন্নাভাব ও অর্থ-সংকটের আবর্তে। আগামী ফসল-ঋতু পর্যন্ত বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে বিষম ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এর উপর বীজ ও চাষের জন্যও চাই তাদের অর্থ। তাই বা তারা পাবে কোথায়? এ ভয়ংকর পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য, "আগামী ফসল পর্যন্ত চাষবাস চালিয়ে যাবার জন্য অধিবাসীদেরই সাহায্য দেয়া নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। যে দেশ তখন নিঃস্ব অবস্থায় সেখান থেকে জোর করে কোন কিছু আদায় কীভাবে সম্ভব?"

সৈন্য ও আমীররা কিশোর বাবরের এই অনুভব-অনুভূতির, মানবিক দৃষ্টি-কোণের অংশীদার হতে চাইলো না। তারা অর্থের দাবী তুললো। কিন্তু বাবর প্রজাদের পীড়ণ করে অর্থ সংগ্রহ না করার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। বাবর যে ধাতুতে তৈরী তাতে তার কাছ থেকে জোর করে যে কোনকিছু আদায় করা যাবে না তাও অভিযান কালের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা বুঝে গিয়েছিল। তাই, প্রত্যাশা পূরণের কোন আশা নেই দেখে একজন দুজন করে তারা নিঃশব্দে সরে পড়তে সুরু করলো। কিছুদিনের মধ্যেই একরকম সঙ্গীশূন্য হয়ে পড়লেন বাবর। সাধারণ সৈন্য ও ছোট-বড় বেগ-আমীরদের মিলিয়ে মাত্র হাজার খানেক অনুচর টিঁকে রইলো তার কাছে। এতো অল্প অনুগামী নিয়ে কী করে তিনি তার আকাঙ্খায় রাজ্য সমরকন্দকে ধরে রাখবেন? কী করেই বা কাটিয়ে উঠবেন এ রাজ্যের অন্ন ও আর্থিক সঙ্কট। দুর্ভাবনায় মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হবার উপক্রম হলো বাবরের।

বেগ-আমীরদের মধ্যে প্রথম দলত্যাগের সূত্রপাত করেন বয়ান কুলীর ছেলে খান কুলী। তারপরেই ইব্রাহিম বেগচীক। আর এভাবে বাবরের বাহিনী মধ্যে থাকা মুঘল সেনা ও আমীররা সকলেই তাকে ত্যাগ করে চলে গেলো। এমন কি, শেষ অবধি সুলতান আহমদ তম্বল পর্যন্ত। অথচ, সমরকন্দ জয়ের পর এই তম্বলকে তিনি অন্যতম প্রধান বেগের পদে উন্নীত করেছিলেন। তিনি ছিলেন তার মাতৃগোষ্ঠীভুক্ত বেগদের মধ্যে বিশিষ্টতম।

দলত্যাগের ঢেউ রোধ করার জন্য খাজা কাজীকে অন্দিজান পাঠানো হলো ঔজুন হাসানের কাছে। সমরকন্দ অভিযানে আসার বেলা এই ঔজুন হাসানের উপরই অন্দিজানের দায়িত্ব অর্পণ করে এসেছিলেন বাবর। খাজা কাজীর প্রতি ঔজুন হাসানের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রয়েছে। হাসানকে প্রভাবিত করে তাকে দিয়ে দল ত্যাগীদের একাংশকে শাস্তিদান ও অন্যদের সমরকন্দ ফিরে

পাঠানোর দায়িত্ব নিয়ে অন্দিজান এলেন খাজা কাজী। কিন্তু ঔজুন হাসান নিজেই অন্তরাল থেকে তখন এই দলত্যাগে উৎসাহ জুগিয়ে চলছিলেন। সুলতান আহমদ তম্বল অন্দিজান ফিরে আসার পর তার সঙ্গে এক হয়ে সব দলত্যাগীদের জোটবদ্ধ করে বাবরের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহের সুর তুললেন তিনি। বাবরের পরের ভাই জহাঙ্গীর মীর্জাকে অন্দিজানের সিংহাসনে বসাবার কারসাজীতে মেতে উঠলো বিদ্রোহীরা। দাবী তুললে, বাবর যখন সমরকন্দ দখল করেছেন তখন অন্দিজান ও অখসী জহাঙ্গীর মীর্জাকে দেয়া হোক।

বিপদ যখন আসে একা আসে না, এই প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে তাল রেখে বড়ো মামা মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খানও এ সময়ে বাবরের কাছে এক পত্র পাঠিয়ে বাবরের সমরকন্দ জয়ের ভাগ স্বরূপ অন্দিজান রাজ্য চেয়ে বসলেন।

বাবর এ পত্র পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি কখনো মোঙ্গল-প্রধানকে অন্দিজান দেবার প্রতিশ্রুতি দেননি। তিনিও সমরকন্দ জয়ের জন্য তাকে কোনরকম সাহায্য সহযোগিতা করেন নি। উভয়ের মধ্যে এনিয়ে কোন রকম চুক্তিও কখনো হয় নি। তবু মোঙ্গল-প্রধানের কাছ থেকে এহেন পত্র কেন ?

বাবরের কথা সত্য হলেও, একথাও ঠিক যে বাবর যে দুবছর সমরকন্দ অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন ওই কাল মধ্যে মোঙ্গল প্রধান কোনরকম শত্রুতাচারণ করে তাকে বিব্রত করেন নি, তার সমরকন্দ জয়ের পথে বাধার সৃষ্টি করেন নি। খুজন্দ দুর্গ উদ্ধারের পর বাবর যখন তার সঙ্গে শাহরুখিয়তে গিয়ে দেখা করেন হয়তো সে সময়ে তিনি বাবরের সাথে কোনরকম শত্রুতাচারণ করবেন না বলে মৌখিক আশ্বাসও দিয়েছিলেন। সুতরাং মনে হয়, সেই মৌখিক আশ্বাসের মূল্য হিসাবে, অথবা বাবরের সমরমন্দ জয়ের পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করার প্রতিদান হিসাবে, তিনি এ সময়ে বাবরের কাছে অন্দিজান চেয়ে বসেছিলেন।

এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন বাবর। তিনি এখন একরকম সঙ্গীহীন অবস্থায় বিপদের মাঝে সমরকন্দে। এ সময়ে মোঙ্গল-প্রধানের কাছ থেকে এ রকম এক অনুরোধ দাবীরই নামান্তর। অন্য পরিবেশের মাঝে এ রকম অনুরোধ এলে তিনি হয়তো বদান্যতা দেখাতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে একে তার চোখ রাঙানি বলেই মনে হল। 'হুকুমের সুর কে সহ্য করতে পারে ?' অন্যদিকে বিদ্রোহিরাও জহাঙ্গীর মীর্জার পক্ষ নিয়ে এই একই অঞ্চল দাবী করেছে। এ সময়ে জহাঙ্গীরকেই বা এ অঞ্চলগুলি কী করে দেয়া যায় ? যদি বাবর তাকে এগুলি এখন দিয়ে দেন, মোঙ্গল-প্রধান তা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ভাবে

গ্রহণ করবেন না। তিনি নিশ্চয়ই এজন্য জবাবদিহি চাইবেন বাবরের কাছে। তাকে আক্রমণ করে বসাও অসম্ভব নয়। উভয় সঙ্কটে পড়ে চুপ হয়ে রইলেন বাবর। কারো অনুরোধ বা দাবীই পূরণ করলেন না। এবং দুঃসহ মানসিক চাপে শেষে তিনি ঘোর অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে বাবর দলত্যাগী কতক মুঘল বেগদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে হৃদয় পরিবর্ত্তনের জন্য তুলূন খাজাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তুলূন খাজা ছিলেন বাবরের দলের সব থেকে সাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সৈনিক। সমরকন্দ বিজয়ের পর মুঘলদের মধ্যে তিনিই বাবরের কাছ থেকে সবথেকে বেশি অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাকে বেগ বা আমীরের পদে উন্নীত করা হয়েছিল। আর এসব অনুগ্রহ পাবার মতো যোগ্য ব্যক্তিও ছিলেন তিনি। সব রকম ভাবে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন। বিদ্রোহীরা তাদের এরূপভাবে প্রভাবিত করেছিল যে তুলূন খাজার কোন কথাতেই কান দিলেন না তারা। তুলূন খাজা মিয়া-দোয়ারের পথ ধরে ফরঘান যাচ্ছিলেন। ঔজুন হাসান ও সুলতান আহমদ তম্বল সে খবর পেয়ে তার বিরুদ্ধে একদল দ্রুতগামী সৈন্য পাঠালেন। তারা অতর্কিতে তুলূন খাজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করলো তাকে।

জহাঙ্গীর মীর্জাকে অন্দিজান ছেড়ে দেবার দাবী বাবর মেনে নিলেন না দেখে ঔজুন হাসান ও তম্বল বালক জহাঙ্গীর মীর্জাকে সঙ্গে নিয়ে অন্দিজান অবরোধ করলেন এবার। অভিযানে বার হবার বেলা বাবর আলী দোস্ত তঘাইয়ের উপর অন্দিজানের শাসন ও প্রতিরক্ষার ভার দিয়ে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে খাজা কাজীও অন্দিজান ফিরে গিয়ে সেখানেই ছিলেন। যারা সমরকন্দ ত্যাগ করে অন্দিজান চলে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রচুর দক্ষ সৈনিক ছিল। খাজা কাজী ফিরে গিয়েই বাবরের প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে এদের বাবরের অনুগামী করে তোলার দিকে মন দেন। এ জন্য শহরের সৈনিক ও তাদের স্ত্রীপুত্র পরিবারের মধ্যে নিজের সম্পত্তি থেকে ১৮০০০ ভেড়া বেঁটে দিয়েছিলেন। অতএব বিদ্রোহীরা যখন অন্দিজান অবরোধ করলো তখন খাজা কাজীর এই পদক্ষেপের দরুণ স্থানীয় সৈন্যরা সকলেই বাবরের পক্ষে ছিল।

বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে বাবরের মা, মাতামহী ও খাজা কাজী তাকে ঘন ঘন চিঠি পাঠাতে থাকলেন তাড়াতাড়ি সাহায্যের জন্য ছুটে আসার আকুতি জানিয়ে। তারা লিখলেন 'এরূপ দুর্দম চাপ পড়ছে যে যদি তুমি

অবিলম্বে সাহায্যের জন্য না আস তবে খুব খারাপ পরিণতি ঘটবে।' লিখলেন, 'তুমি অন্দিজানের সৈন্য ক্ষমতা বলেই সমরকন্দ অধিকার করেছ। যদি অন্দিজানের শাসক রূপে তুমি টিঁকে থাকতে পার তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আবার সমরকন্দ দখল করতে পারবে।'

বাবর যে অন্দিজান রক্ষার জন্য ছুটে যাবেন তার উপায় কী! তিনি তখন সবে কঠিন অসুখ থেকে কোন মতে বেঁচে উঠেছেন। গভীর উদ্বেগ ও মানসিক চাপে তার অবস্থা এতো সংকটজনক হয়ে উঠেছিল যে, পুরো চারদিন বাক-রহিত অবস্থায় ছিলেন। তুলোয় ভিজিয়ে ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল ও তরল খাদ্য তার জিভে দেয়া হচ্ছিল। সাধারণ সৈনিক ও আমীর মিলিয়ে যে হাজার-খানেক অনুগামী তার সঙ্গে ছিলেন তাদের অনেকেই তখন তার জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে যে যার নিজ নিজ পথ দেখেছে।

পুরোপুরি অসুখ সারতে আরো দিন চার পাঁচ কেটে গেল। কিন্তু তখনো তার শরীর দুর্বল, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে। এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে আরো কয়েকদিন সময় গেল। তার কয়েকদিন পরেই মা, মাতামহী অইসান দৌলত বেগম ও খাজা কাজীর কাছ থেকে আবার পত্র পেলেন। এরূপ করুণ মিনতি জানিয়ে পত্র দিয়েছেন তারা যে চুপ হয়ে বসে থাকার মতো মনের অবস্থা রইলো না বাবরের। আর দেরি না করে, রজব মাসের এক শনিবারে সমরকন্দ থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি অন্দিজানের উদ্দেশ্যে। এ সময়ে তিনি সবে একশো দিন রাজত্ব করেছেন সমরকন্দে।

পরের শনিবার খুজন্দ পৌঁছালেন বাবর। সেদিনই চরের কাছে খবর পেলেন, ঠিক পূর্ব শনিবারে, অর্থাৎ যেদিন তিনি সমরকন্দ ছেড়েছেন, সেদিনই আলী দোস্ত তঘাই বিদ্রোহীদের কাছে অন্দিজান দুর্গ সমর্পণ করেছেন।

এই বিয়োগান্তক ঘটনার পশ্চাতে একটি ছোট্ট করুণ ইতিহাস রয়ে গেছে। বাবর যখন বাকরহিত অবস্থায় শয্যাশায়ী তখন ঔজুন হাসানের এক দূত কতক রাজদ্রোহাত্মক প্রস্তাব নিয়ে সমরকন্দে উপস্থিত হন। বাবরের অনুগামী আমীররা নির্বোধ কূটনীতিজ্ঞের মতো তার কাছে বাবরের শোচনীয় শারীরিক অসুস্থতার কথা প্রকাশ ক'রে দিলেন। এমন কি বাবরের শয্যাপার্শ্বে এনে তার অবস্থাও দেখালেন। বাবর আর বাঁচবে না এ ধারণা থেকে সে দৌত্যকার্য অসমাপ্ত রেখেই অন্দিজান ফিরে গিয়ে ঔজুন হাসানকে সেকথা জানালে। ঔজুন হাসান চতুরভাবে সে ঘটনাকে কাজে লাগালেন। অন্দিজান দুর্গ মধ্যে অবস্থিত

আলী দোস্ত তঘাইয়ের কাছে পাঠালেন সে খবর তিনি। তিনি প্রথমে তা অবিশ্বাস করলেও, দূতটি যখন কসম খেয়ে জানালে যে সে নিজের চোখে দেখে এসেছে বাবরের মুখে তুলো ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ও তরল খাদ্য দেয়া হচ্ছে ও সকলে তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে তখন আর তার কথা অবিশ্বাস করতে পারলেন না। বিদ্রোহীদের অবরোধ প্রতিহত ক'রে চলার মনোবল ভেঙে পড়লো তার। বোধবুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল। বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিলেন তিনি। আত্মসমর্পণের সর্তাদি ঠিক হয়ে যাবার পর দুর্গ-সমর্পণ করলেন তাদের হাতে। অথচ দুর্গের ভেতর তখন প্রতিরোধ ক'রে চলার মতো সৈন্যের অভাব ছিলনা, ছিলনা খাদ্যেরও কোন অভাব।

বাবর জীবিত. সে তার অনুগামীদের নিয়ে খুজন্দ উপস্থিত হয়েছে, এ খবর বিদ্রোহীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করলো। অন্দিজান আত্মসমর্পণ ক'রে থাকলেও এ সংবাদে যাতে সেখানে আবার পালটা অভ্যুত্থান না ঘটে সে জন্যে খাজা কাজীকে বন্দী করলো বিদ্রোহীরা। দুর্গের ফটকে অতি নির্মমভাবে বর্বরের মতো ফাঁসীতে ঝোলালো তাকে। তার পরিবার. গোষ্ঠী ও অনুগামী লোকজনদেরও বন্দী করা হলো। লুঠ করা হলো তাদের বিষয় সম্পত্তি।

এ ঘটনায় দারুণ মর্মাহত হলেন বাবর। খাজা কাজীকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। ভালবাসতেন। বাবরের নিজের কথায় 'তিনি ছিলেন একজন ওয়ালী (সন্ত)।'

বাবরের সঙ্গে তখন মাত্র হাজার খানেক সৈন্য। সুতরাং অন্দিজানের আত্মসমর্পণ এবং তারপর খাজা কাজী ও তার অনুগামীদের দুর্দশার খবর তাকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত ক'রে ফেললো। বিদ্রোহীদের দমন ও অন্দিজান উদ্ধারের আশা মন থেকে মুছে গেল তার।

"অন্দিজানকে ধরে রাখার জন্য সমরকন্দকে হাতছাড়া করে চলে এলাম। এসে দেখি অন্দিজানকেও হারিয়ে বসে আছি আমি। আমার পরিস্থিতি এখন ঠিক তাই তুর্কী প্রবাদ বাক্যটির মতো—'বোকার মতো এক ঠাঁই থেকে পা সরিয়ে অন্য ঠাঁইয়ে পা ফেলার বেলা দেখা গেল সে জমিও পায়ের নিচ থেকে সরে গেছে'।"

॥ ৬ ॥

একূল ওকুল দুকূল হারিয়ে এবার গভীর বিষাদ ও অন্তহীন সংকটের খাদে পড়ে গেলেন বাবর।

'এতকাল একটি দেশের সার্বভৌম রাজা ছিলাম আমি। এভাবে দেশ ও অনুগামীদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িনি এর আগে। বোধশক্তির বিকাশ হওয়ার পর থেকে কখনো এর আগে আমি এমন দুঃখ ও দুর্ভোগের মধ্যে পড়িনি।'

যে বড়ো মামার পরোক্ষ হুকুমের সুর তার কাছে অসহ মনে হয়েছিল, এবার তারই শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পেলেন না তিনি। কাশিম বেগ কুচীনকে তিনি তাসকিণ্ট পাঠালেন মোঙ্গল প্রধানের কাছে। আবেদন জানালেন অন্দিজানের বিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য।

সে ডাকে সাড়া দিলেন মাহমুদ খান। ভাগনেকে সাহায্য করার জন্য এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে জুলঘে-ই-অহনগরানের (অহনগরানের উপত্যকা) পথ ধরে কীন্দীরলীক গিরিপথের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। বাবরও তার অনুগামীদের নিয়ে খুজন্দ থেকে কীন্দীরলীক এলেন। মিলিত হলেন মামা মাহমুদ খানের সাথে। কীন্দীরলীক ও আমানি জয় ক'রে নিয়ে মিলিত বাহিনী অখসীর কাছে এলো। সেখানে ছাউনি ফেললো।

প্রতিপক্ষও চুপ করে বসে রইলো না। তারাও সর্বশক্তি নিয়ে অখসী জমায়েত হলো। সমরায়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য যাতে সময় মেলে সেজন্য তারা মাহমুদ খানের সঙ্গে শান্তি-আলোচনা জুড়ে দিলে।

বাবর এতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তার মতে, মাহমুদ খানের অনেক দুর্লভ গুণ ও প্রতিভা থাকলেও সামরিক প্রতিভা ছিলনা। প্রতিপক্ষের পরিস্থিতি ঘটনাবলীর চাপে তখন এমন যে কালক্ষেপ না ক'রে জোর কদমে এগিয়ে গেলে বিনা যুদ্ধেই দেশ দখল ক'রে নেয়া যেতো। সে কাজটি না ক'রে তিনি প্রতিপক্ষের চাতুরীর ফাঁদে পা দিলেন। সায় দিয়ে বসলেন শান্তি আলোচনায়।

প্রতিপক্ষের তরফ থেকে এ শান্তি আলোচনায় যোগ দিল খাজা আবদুল

মকারম ও তম্বলের বড় ভাই বেগ তীল্‌ব। দুই প্রতিনিধি অতি চতুরভাবে এই শান্তি প্রস্তাব এগিয়ে নিয়ে গেলেন। মাহমুদ খানের প্রতিনিধিদের ঘুষ দিয়ে নিজেদের দলে টেনে তাদের সাহায্যে মোঙ্গল-প্রধানকে এমন প্রভাবিত করলেন যে তিনি শান্তি প্রস্তাবে সায় দিয়ে সৈন্য প্রত্যাহার ক'রে দেশে ফিরে যেতে রাজী হয়ে গেলেন।

বাবরের অবস্থা এবার আরো শোচনীয় হলো। তার সাথে যে সব বেগ ও সৈনিকেরা ছিল তাদের অধিকাংশেরই স্ত্রী ও পরিবারবর্গ রয়েছে অন্দিজানে। যেই তারা দেখলো, বাবরের আর অন্দিজান ফিরে পাবার আশা নেই তখন পরিবারের টানে তাকে ত্যাগ ক'রে অন্দিজানের পথ ধরলো বেশীর ভাগ। এভাবে হাজার অনুগামীর মধ্যে প্রায় সাত-আটশো বিদায় নিলো। স্বেচ্ছাকৃত ভাবে দুঃখ-কষ্ট ভরা নির্বাসিত জীবন বরণ ক'রে নিয়ে তার সাথে রইলো শুধু শ দুই-তিনেক লোক।

এই করুণ অবস্থার মধ্যে পড়ে বাবরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। খুব এক চোট কাঁদলেন তিনি। চলে এলেন আবার খুজন্দ। এখানে তার মা ও মাতামহী অইসান দৌলত বেগমকে পাঠিয়ে দিল শত্রুপক্ষেরা। পাঠিয়ে দিল তার অনুগামীদের মধ্যেও কতকের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে।

রমজান মাসটি বাবর খুজন্দেই কাটিয়ে দিলেন। তারপর আবার সুরু করলেন মামার মন জয় ক'রে তার কাছ থেকে সামরিক সাহায্য লাভের চেষ্টা। এ জন্য তার কাছে লোক পাঠালেন বাবর। জহাঙ্গীর মীর্জা ও তার সমর্থকদের সঙ্গে চুক্তির দরুন তিনি আর বাবরের অন্দিজান উদ্ধারের আগ্রহে উৎসাহ দেখালেন না। বাবর তখন সমরকন্দ অভিযানের প্রস্তাব তুললো। এবার তার প্রয়াস সফল হলো। এ উদ্যমে তাকে সাহায্য করতে রাজী হলেন মাহমুদ খান। চার-পাঁচ হাজার সৈন্য সহ তিনি তার ছেলে সুলতান মুহম্মদ এবং আহমদ বেগকে পাঠালেন বাবরকে এ অভিযানে সাহায্যের জন্য। তিনি নিজেও এ জন্য আউরাটীপা পর্যন্ত এলেন। এখানে তার সাথে দেখা করলেন বাবর। তারপর য়ার-ঈলাকের পথ ধরে বাবর সমরকন্দের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললেন। ছাউনি ফেললেন এসে বুর্খ-ঈলাক দুর্গে। সুলতান মুহম্মদ ও আহমেদ বেগ অন্য এক পথ ধরে য়ার ঈলাক পৌছলেন। বাবর তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার আগেই তারা খবর পেলেন যে শইবানি খান তার উজবেগ বাহিনী নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যেই তিনি শিরাজ দখল ক'রে সে এলাকায় লুটপাট

চালিয়েছেন। এ খবরে ভয় পেয়ে গেলেন তারা। বাবরের জন্য একটুও অপেক্ষা না ক'রে, পিছু হটে সোজা দেশে ফিরে গেলেন। বাবরই বা কী আর করেন তখন। বাধ্য হয়ে তিনিও খুজন্দ ফিরে এলেন।

কিন্তু বেশিদিন চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না বাবর। তা যে তার চরিত্রের বিপরীত। "যে লোক দিগ্বিজয়ের বাসনায় উদ্দীপ্ত, স্বপ্ন দেখছে বিরাট এক সাম্রাজ্যের, সেই আমি কি একটি-দুটি পরাজয়ে দমে গিয়ে চুপচাপ বসে চারদিকে অলস ভাবে তাকিয়ে দেখে চলার মানুষ! এবার আমি খানের কাছে তাসকিন্ট গেলাম অন্দিজান সম্পর্কে আমার পরিকল্পনায় তার সহায়তা লাভের জন্য। ভাণ করলাম, শাহ বেগম (সৎ দিদিমা) ও অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। ৭।৮ বছর হলো তাদের আমি দেখিনি। উপস্থিত হবার দিনকয়েক পর আমার (অভিযানে) সাথী হবার জন্য ৭।৮ শো সৈন্য সহ সৈয়দ মুহম্মদ মীর্জা দুঘলাত আয়ুব বেগচীক ও জান হসন (বারীন)-কে নিযুক্ত করা হলো। বেরিয়ে পড়লাম এই সাহায্যকারী সেনা নিয়ে। খুজন্দ পৌছে একটুও সময় নষ্ট না ক'রে এগিয়ে চললাম কন্দ-ই-বদাম বাঁ দিকে রেখে, রাতের আঁধারে নসুখ দুর্গে পৌছে মই বেয়ে তার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। নিলাম এটিকে দখল ক'রে।"

"পরের দিন সকালে মোঙ্গল বেগেরা আমার কাছে দরবার করলে, 'আমাদের সঙ্গে মাত্র এই সামান্য লোক। তাছাড়া একটি নিঃসঙ্গ দুর্গকে নিজেদের অধিকারে ধরে রাখার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ নেই।' তারা যা বললে তা খুব খাঁটি কথা। সেখানে অবস্থান নিয়ে থাকার কোন সার্থকতা নেই দেখে শেষ পর্যন্ত পিছু হটে এলাম। ফিরলাম আবার খুজন্দ।'

'খুজন্দ একটি ছোট এলাকা। এর উপর নির্ভর ক'রে দুশোজন অনুচরের খরচ চালানো কারো পক্ষে অসম্ভব। আর, যে ব্যক্তি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে, কী ক'রেই বা সে এমন একটি তুচ্ছকর এলাকায় তুষ্ট হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে?'

অতএব আবার সমরকন্দের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন বাবর। ঠিক করলেন নিজের যতোটুকু যা শক্তি আছে তার উপর নির্ভর করেই সমরকন্দ জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন তিনি। কিন্তু সেখানে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালাবার জন্য যে সুবিধামতো স্থানে একটি ঘাঁটি দরকার। এজন্য মনে মনে বাছলেন তিনি পশাঘরকে। এটি য়ার-ঈলাকের একটি গ্রাম। আগে খাজা কাজীর সম্পত্তি ছিল।

গণ্ডগোলের সময় আউরাটীপার শাসনকর্তা মুহম্মদ হুসেন কুরকানের দখলে চলে যায়। তিনি মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খানের প্রতিনিধি রূপে আউরাটীপা শাসন ক'রে চলছিলেন। সম্পর্কে তিনিও বাবরের মামা। অতএব নিজের পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে বাবর এক শীতঋতুর জন্য তার কাছে পশাঘর গ্রামটি ধার চাইলেন। তিনি রাজী হলেন সে প্রস্তাবে।

মুহম্মদ হুসেনের সম্মতি পাওয়ামাত্র পশাঘর রওনা হলেন বাবর। যাব র বেলা জমিন পৌছে জ্বরে পড়লেন তিনি। তবু পার্বত্য পথ ধরে এগিয়ে রাতের আঁধারে রবাত-ই-খাজায় পৌছে, সকলের অলক্ষ্যে মই বেয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে সেখানকার দুর্গটি দখল ক'রে নেয়ার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু সময়মতো পৌছতে না পারায় সে পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। পিছু হটে, কোথাও না থেমে সোজা চলে এলেন পশাঘর। গায়ে জ্বর নিয়েও এজন্য একটানা ৭০-৮০ মাইল ঘোড়া ছোটালেন তিনি।

পশাঘর পৌছে সেখানেই ঘাঁটি গাড়লেন তিনি। শীত কালটা সেখানে কাটাবার জন্যে সাধ্য মতো সুব্যবস্থা করলেন। ইব্রাহীম সারু, ওয়েইস লাঘরী, শেরীম তঘাই প্রভৃতিকে পাঠালেন য়ার-ঈলাকের বিভিন্ন দুর্গ দখল করার জন্য। যার-ঈলাক সমরকন্দের অধীন রাজ্য। এখানকার শাসনকর্তা তখন সৈয়দ য়ুসুফ বেগ। সমরকন্দের রাজা সুলতান আলী মীর্জার পেয়ারের লোক। অনুপ্রবেশকারীরা তার এলাকার স্থিতি বিপন্ন ক'রে তুলছে দেখে তাদের হটিয়ে দেবার জন্য সৈয়দ য়ুসুফ বেগ তার ভাইপো আহমদ-ই-য়ুসুফকে সেখানে পাঠালেন। কিন্তু আহমদ-ই-য়ুসুফ বাবরের অনুগামীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। তারা ছলে-বলে-কৌশলে য়ার-ঈলাকের অধিকাংশ অঞ্চল দখল ক'রে নিলো। এবার সুলতান আলী মীর্জার টনক নড়লো। ব্যর্থতার দরুন তিনি সৈয়দ য়ুসুফ ও তার ভাইপোকে বরখাস্ত করলেন। পাঠিয়ে দিলেন তাদের খুরাসান। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিজেই এগিয়ে এলেন য়ার-ঈলাকে বাবরকে দমন করার জন্য। বাবরের সঙ্গে তখন মাত্র দুশো থেকে তিনশো অনুগামী। তিনি উপলব্ধি করলেন, এই লোক হাসানো শক্তি নিয়ে আলী মীর্জার সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া মূর্খতা। শান্তি আলোচনা সুরু করলেন অগত্যা। প্রতিপক্ষের কাছে নতি স্বীকার ক'রে, দখল করা অঞ্চল ছেড়ে আউরাটীপা ফিরে এলেন।

এ ক'মাসের আপ্রাণ দুঃসাহসী প্রচেষ্টা সাফল্যের আলো ছড়াতে ছড়াতে

সহসা শূন্যে মিলিয়ে গেল। বেদনায়, ক্ষোভে, লজ্জায় বাবর আর খুজন্দের অধিবাসীদের কাছে মুখ দেখাতে চাইলেন না। গত প্রায় দু' বছর তারা নিজেরা সব রকম কষ্ট স্বীকার ক'রেও বাবর ও তার অনুগামীদের যা কিছু খরচ জুগিয়েছে। কিন্তু খুজন্দ না গেলে কোথায়ই বা যাবেন তিনি? কোথায় আর তার জন্য নিরাপদ আশ্রয় রয়েছে? প্রখর আত্মসম্মানবোধ তাকে বন-বাসে প্ররোচিত করলো। আশ্রয় নিলেন গিয়ে আউরাটীপার দক্ষিণ দিকের এক পার্বত্য অঞ্চল ঈলাকে। নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি এখন পুরোপুরি হতাশ। এই গভীর হতাশা ও অসন্তোষ তার বোধ-বুদ্ধি-চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো। নিজের জীবন, মানব সমাজ ও তার রীতি-চরিত্রের প্রতি এক বিচিত্র বিতৃষ্ণা বিরক্তি ও বৈরাগ্য দেখা দিল মনে। শুধু দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলার মতো দিন কাটিয়ে চললেন তিনি।

ঈলাকের এই পাহাড়ী উপত্যকাতেই তিনি যখন ভবঘুরের মতো বাস ক'রে চলেছেন তখন আচমকা একদিন তার দেখা হলো খাজা আবুল মকারমের সাথে। তিনিও একজন ভবঘুরে। বাবরের দৈন্যদশা দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। ভগবান যাতে বাবরের প্রতি অনুগ্রহ দেখান এ জন্য কাতরভাবে তার কাছে প্রার্থনা জানালেন তিনি। তারপর কখন কোথায় যে তিনি চলে গেলেন, বাবর আর তাকে দেখতে পেল না।

সেদিন বৈকালিক নমাজের পরই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। উদয় হলো এক অশ্বারোহী। নাম তার য়ুল-চুক। আলী দোস্ত তঘাইয়ের কাছ থেকে এক বার্তা নিয়ে এসেছে সে বাবরের কাছে। এই তঘাই-ই বাবর রোগশয্যায় জীবন-সংকট মধ্যে রয়েছেন খবর পেয়ে বিদ্রোহীদের কাছে অন্দিজান দুর্গ সমর্পণ করেছিলেন। য়ুল-চুক মনিবের সেই বার্তা বাবরের হাতে দিল। আলীদোস্ত তঘাই লিখেছেন: "অতীতে আমি বহু গুরুতর অপকর্ম করেছি সন্দেহ নেই। তবু আমার প্রতি করুণা ও অনুকম্পা দেখিয়ে আপনি আমার কাছে চলে আসুন। যদি আসেন; আপনার হাতে মরঘীনান অর্পণ ক'রে, অবশিষ্ট জীবন অনুগতভাবে একাগ্র চিত্তে আপনার সেবা ক'রে, আমি আমার সব অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার, মনের অনুশোচনা লাঘব করার সুযোগ পাই।"

নৈরাশ্যের গভীর আঁধারের মাঝে এ যেন আলোকের দূতের আবির্ভাব। এক মুহূর্তও দ্বিধা করলেন না বাবর। এক পলকও দেরি করলেন না। সূর্য অস্ত গেছে। ঘনিয়েছে সন্ধ্যা। যাক! সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সাথে সাথে

তিনি সঙ্গীদের সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সারা দিন রাত ঘোড়া ছুটে চললো। কোথাও থামলো না কেউ। তিন রাত দুদিন কেটে গেল এমনি। তৃতীয় সকাল এলো। একটানা একশো মাইলের মতো পথ পাড়ি দিয়েছেন। মরঘীনান আর মাত্র চার মাইল দূরে। এমন সময়ে বাবরের কাছে নিজেদের মনের দ্বিধা ও সন্দেহের প্রকাশ ঘটালেন ওয়েইস বেগ ও অন্যান্য সঙ্গী বেগেরা। বললেন ঃ আলী দোস্ত তঘাইকে এভাবে চোখ বুজে বিশ্বাস ক'রে বসা উচিত হচ্ছে না আমাদের। এই লোকটিই এর আগে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের হাতে অন্দিজান তুলে দিয়েছিল। এতকাল আমাদের কোন যোগাযোগও ছিল না তার সাথে। বর্তমান প্রস্তাব নিয়েও আমাদের মধ্যে বিশদ কোন আলোচনা বা দূত চলাচল হয়নি। হয়নি কোন রকম শর্ত কিংবা চুক্তিও। সে যে আমাদের ফাঁদে ফেলার মতলবে নেই কে তা বলতে পারে ?

সত্যিই তো ! বিরাট ভাবনার কথা। কিন্তু এখন যে অনেক দেরি হয়ে গেছে ! মারঘীনানের কাছাকাছি হয়ে এখন আর পরিকল্পনা বদল করা যায় কী করে, পিছিয়ে যাওয়া যায় কী ভাবে ! অকল্পনীয় কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে কী ভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, অগত্যা তা নিয়ে শলা-পরামর্শ করতে বসলেন বাবর। তাদের বোঝালেন ঃ না থেমে একটানা এতদূর আসার ফলে বাহন শুদ্ধ তারা সকলেই এখন ক্লান্ত ও কাহিল অবস্থায়। শত্রু-রাজ্য মধ্যে এভাবে এতদূর চলে আসার পর ফিরে যাবার চেষ্টা করাটাই নির্বুদ্ধিতা হবে। বরং যে পরিস্থিতিই দেখা দিক না কেন এখন, তার মোকাবিলা করাই বিধেয়। 'কোন কিছুই ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া ঘটতে পারে না'। অতএব তার উপর অটুট বিশ্বাস রেখে এখন আমাদের সাহসভরে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা উচিত।

সেই সিদ্ধান্তই নেয়া হলো। পরদিন সকালে সাহসভরা মন নিয়ে সদলে দুর্গ-ফটকের কাছে উপস্থিত হলেন বাবর। পৌঁছে দেখলেন, বন্ধ ফটকের ওপারে দাঁড়িয়ে আলী দোস্ত তঘাই তার পথ চেয়ে আছেন। বাবর উপস্থিত হতে তিনিই প্রথম শর্তের কথা তুললেন। শর্ত ঠিক হয়ে যেতেই দুর্গের ফটক খুলে দেয়া হলো। অনুগামীদের নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন বাবর। কুর্নিশ করে তার প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ ঘটালেন আলী দোস্ত। দেয়াল ঘেরা শহর মধ্যে যোগ্য একটি আবাসে তার বাসের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এমনি ক'রে, অতি আকস্মিক ভাবেই বাবর মরঘীনান শহরের আধিপত্য লাভ করলেন।

দাঁড়াবার মতো একটু খানি ঠাঁই পেয়েই আবার ভাগ্য ও পরিবেশের সাথে লড়াই জুড়ে দিলেন বাবর। মন দিলেন মরঘীনানে ভাল ভাবে শিকড় গেড়ে বসার দিকে, রাজ্য বিস্তারের দিকে। অনুগামীদের চারিদিকে পাঠালেন লোক আর অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। অসুবিধা হলো না। তার ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বৈশিষ্ট্য, নেতৃত্ব দেবার মতো ক্ষমতা ও গুণাবলী এবং বিশেষ করে তার শৃঙ্খলাপ্রিয়তা শান্তির জন্য সদা উন্মুখ সাধারণ মানুষের কাছে তাকে প্রিয় ক'রে তুললো। তারা তাকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে সুরু করলো। সাহসী ও রোমাঞ্চ সন্ধানীরা অনেকেই এসে তার দলে যোগ দিল, ভাগ্যের লড়াইয়ে তার সুখ দুঃখের ভাগীদার হতে চাইলো।

ফরঘানের অন্যান্য অঞ্চলে তখন উলটো চিত্র। জহাঙ্গীর মীর্জাকে পুতুল খাড়া ক'রে সুলতান আহমদ তম্বল ও ঔজুন হাসান সেখানে তখন স্বেচ্ছাচার ও জুলুমের রাজত্ব ক'রে চলেছেন। চাষী সম্প্রদায়, উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা ডুবে গেছে সেখানে চরম দৈন্যের মধ্যে। সকলেই এই 'কাফের তুল্য ও জঘন্য স্বৈরাচারীদের' সরিয়ে বাবরকে সেখানে দেখতে উৎসুক। এমন কি তম্বল ও ঔজুন হাসানের অনুগামীর মধ্যে অনেকেও পরিবর্তন আনার জন্য আগ্রহী।

এই হাওয়া বদল বাবরকে খুশী ক'রে তুললো। এর পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত একশো অনুচর সহ কাশিম বেগকে পাঠালেন অন্দিজানের অধিবাসীদের উদ্দীপ্ত ক'রে তার স্বপক্ষে অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে। ওয়েইস লাঘরী, সৈয়দ করা ও ইব্রাহীম সারুকে পাঠালেন খুজন্দ নদীর ওপারে, সেখানকার লোকদের স্বপক্ষে আনার জন্য।

বাবর মরঘীনানের দখল লাভ করেছে, আশেপাশের অঞ্চলগুলি দখল ক'রে নেবার মতলবে সেখানে চর ও সেনা পাঠিয়েছে জেনে ঔজুন হাসান ও সুলতান আহমদ তম্বল সজাগ হয়ে উঠলেন। নিজেদের মোঙ্গল সেনাদলকে একত্র করলেন। যারা অন্দিজান ও অখসী সেনাবাহিনীতে কাজ করছিলো তাদেরও ডাকরা দিলেন। একাকী জহাঙ্গীর মীর্জাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মরঘীনান অবরোধ ক'রে বাবরকে উৎখাত করার জন্য। সৈন্য সমাবেশ করলেন মরঘীনান থেকে দু' মাইল দূরে, সপান নামে একটি গাঁয়ে। বাবরের বাছাই সৈন্যেরা তখন সকলেই বাইরে। তবু দমলেন না তিনি। তাড়াতাড়ি

কিছু সৈন্য সংগ্রহ ক'রে তাদের প্রতিরোধ ক'রে চললেন। দুদিন ধরে চেষ্টা ক'রেও শত্রু বাহিনী শহরের দিকে এগোতে পারলো না।

ইতিমধ্যে কাশিম বেগ ও ইব্রাহীম সারু তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে বাহিনী নিয়ে বেশ গৌরব করার মতো সাফল্য লাভ করেছেন। কাশিম বেগ যে শুধু অন্দিজানের দক্ষিণে থাকা পার্বত্য এলাকার আশপরী, তুরুকশার ও চিগরক দখলে এনেছেন তাই নয়, মালভূমি ও নিম্নভূমির চাষী সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলিকেও স্বপক্ষে আনতে পেরেছেন। ইব্রাহিম সারুও অখসী শহরে সেনাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন। ঔজুন হাসানের লোকেরা দুর্গের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে বড়ো মামা মাহমুদ খানের কাছ থেকেও সাহায্য এলো। বাবরকে সাহায্য করার জন্য তিনি হায়দার কুকুলদাসের ছেলে বান্দা আলী, হাজি ঘাজী মনঘিত, বা'রীন তুমান প্রভৃতিকে পাঠিয়েছেন। ফলে বাবরের অবস্থা বেশ শক্তিশালী হলো। শত্রুদের হটিয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধার এখন তার কাছে আর দুঃস্বপ্ন বলে মনে হলো না। অখসীতে অভ্যুত্থান ঘটেছে, শহর এখন ইব্রাহীম সারুর দখলে, তার অনুগামীরা পালিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন এ খবর পৌঁছল এসে ঔজুন হাসানের কাছে মরঘীনানে। দুর্গের লোকদের সাহায্য করার জন্য তিনি তার বাহিনী থেকে বাছাই করা এক সৈন্যদল পাঠিয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু তাদের সাহায্য করার জন্য অখসী পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো না সেনাদল। তার অনেক আগেই. তারা যখন নদী পার হবার চেষ্টায় ব্যস্ত, বাবরের মুঘল বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেটে সাবাড় করলে তাদের। অলৌকিকভাবে জনাকয়েক শুধু রক্ষা পেয়ে গেল। তারা ঔজুন হাসান ও সুলতান আহমদ তম্বলের কাছে এই মর্মান্তিক বিপর্যয়ের খবর বয়ে নিয়ে এলো। ঔজুন হাসান ও তম্বল এ সংবাদে রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়লেন। বর্তমানে মরঘীনানে থাকা নিরাপদ নয় বুঝে তড়িঘড়ি পিছু হটলেন তারা। বেসামাল হয়ে বিশৃঙ্খল ভাবে দ্রুত অন্দিজানের পথ ধরলেন।

অন্দিজান পৌঁছে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন তার জন্যও একেবারেই তারা প্রস্তুত ছিলেন না। হতবাক হয়ে দেখলেন, অন্দিজানের দুর্গরক্ষক, ঔজুন হাসানের ভগ্নীপতি নাসির বেগ বাবরের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। দুর্গের দ্বার তাদের জন্য বন্ধ।

অন্দিজা রক্ষা, অখসী দুর্গে সাহায্য পাঠানো ও মরঘীনান অবরোধে ব্যর্থ-

তার দরুন ঔজুন হাসান ও তম্বল একে অপরকে এবার দোষারোপ শুরু করলেন। ঐক্যে ফাটল ধরে গেল তাদের। আলাদা হয়ে গেলেন দুজনে। পরিবারবর্গকে রক্ষার জন্য ঔজুন হাসান ছুটলেন অখসী। সুলতান আমেদ তম্বল যাত্রা করলেন তার পুরানো ঘাঁটি আউশ। পথে জহাঙ্গীর মীর্জা ও তার ঘরোয়া বাহিনী তার সঙ্গে যোগ দিল।

প্রতিপক্ষ হটে যেতে, পরদিন সকালেই বাবর মরঘীনান থেকে অন্দিজান রওনা হলেন। দুপুরেই পোঁছে গেলেন সেখানে। নাসির বেগ ও তার দুই ছেলে অভ্যর্থনা করে দুর্গ মধ্যে নিয়ে গেলেন তাকে। দু বছর পর ১৪৯৮ অব্দের জুন মাসে আবার পিতৃরাজ্য ফিরে পেলেন বাবর। তবে, এখনো পুরো রাজ্য নয়। সবে মরঘীনান ও অন্দিজান এই দুটি জেলা মাত্র।

অতএব চুপ হয়ে অন্দিজান বসে রইলেন না বাবর। পিতৃরাজ্য শত্রু শূন্য ক'রে সবার আগে নিজের স্থায়িত্ব ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। সেনাদল নিয়ে ছুটলেন তাই তিনি অখসী। করলেন দুর্গ অবরোধ। দুর্গ রক্ষা অসম্ভব দেখে' শর্ত-সাপেক্ষে তা সমর্পণে রাজী হলেন ঔজুন হাসান। শর্ত, পরিবার বর্গ ও অনুগামীদের নিয়ে তাকে নিরাপদে দেশত্যাগ করতে দিতে হবে। রাজী হয়ে গেলেন বাবর। অখসীও এবার তার দখলে এলো।

একই দশা হলো সুলতান আহমদ তম্বলের। তার অপশাসন ও নিপীড়নে উত্যক্ত হয়ে আউশের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করলো তার বিরুদ্ধে। লাঠি সোঁটা পাথর নিয়ে আক্রমণ ক'রে দেশছাড়া হতে বাধ্য করলে তাকে। জহাঙ্গীর মীর্জা ও কতক অনুগামীকে নিয়ে তম্বল আশ্রয় নিলো গিয়ে উরখন্দের আউজকিন্ট দুর্গে। আউশের অধিবাসীরাও বাবরকে বসালো তাদের রাজপদে।

বিদ্রোহীদের নির্মূল ক'রে একে একে সব গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুলি দখল করলেন বাবর, উদ্ধার করলেন সমগ্র পিতৃরাজ্য। মন দিলেন এবার সংগঠনে। অখসী ও কাসান,-রাজ্যের উত্তরদিককার এই দু জেলার উন্নতির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলেন তিনি।

মামা মাহমুদ খান তার সহায়তার জন্য যে মুঘল সেনা পাঠিয়ে ছিলেন তাদেরও এবার বিদায় করা হলো। রুক্ষ ও স্থূল আচার ব্যবহার, অত্যাচার ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তির জন্য প্রথম থেকেই বাবর মুঘলদের উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। "অসংখ্যবার এরা আমার মুসলমান প্রজাদের বন্দী ও লুণ্ঠন করেছে। একই আচরণ করেছে খাজা কাজীর অনুগামীদের প্রতি। নিজেদের বেগদের প্রতিই

বা কি আনুগত্য দেখিয়েছে এরা, যে আমাদের প্রতি আনুগত্য দেখাবে ?" কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মুঘলদের পছন্দ না করলেও, পরিস্থিতিতে পড়ে বার বার বাবরকে তাদেরই সাহায্য নিতে হয়েছে। বার বার এর অবাঞ্ছিত ফল ভোগও করতে হয়েছে। সমরকন্দে তার সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য এরাই প্রথম তাকে ত্যাগ ক'রে চলে আসে ও ফরঘানে ফিরে বিদ্রোহের পতাকা তোলে। ঔজুন হাসান ও সুলতান আহমদ তম্বলের নেতৃত্বে এদের বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলেই তাকে দীর্ঘ দুবছর রাজ্যহারা হয়ে কাটাতে হয়েছে।

কিন্তু মাহমুদ খানের মুঘল সৈন্যদের ফেরৎ পাঠাবার পরও তার বাহিনীতে এ সময় মুঘল সেনার সংখ্যা নেহাৎ কম ছিলনা। ঔজুন হাসান ও সুলতান আহমদ তম্বলকে দেশছাড়া করার পর এ সংখ্যা আরো বেড়ে যায়, তাদের বাহিনীর একাংশকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে নিজ বাহিনীতে স্থান দিতে গিয়ে। শুধু তার মায়ের অধীনেই এ সময়ে ১৫০০ থেকে দু'হাজার মুঘল ছিল। এছাড়া রয়েছে ঔজুন হাসান ও তম্বলের বাহিনী থেকে যারা তার নিজের বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আছে এর উপর হিসার থেকে চলে এসে যারা তার দলে যোগ দিয়েছে, তারাও।

বাবর শৃঙ্খলাপ্রিয়। নিরীহ ও প্রতিরক্ষায় অক্ষম সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার ও লুটপাটের তিনি ঘোর বিরোধী। তায়, ফরঘান তার মাতৃভূমি। মুঘলরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস মতো সুযোগ পেলেই অত্যাচার ও লুটপাট করে চলেছে দেখে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নেবার সংকল্প নিলেন। ফরমান জারী ক'রে দিলেন মুঘলরা যেন ফরঘান রাজ্যের ভেতর, এমনকি তার নিকট অঞ্চল গুলিতেও লুটপাট ও অত্যাচার না করে। যা তারা লুটপাট ক'রে নিয়েছে তা যেন অবিলম্বে প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেয়। ফলে যা হবার তাই হলো। মুঘলরা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলো। পুরো মুঘল সেনাদল বাবরের ছাউনি ত্যাগ ক'রে রবাতিক ঔচীনীর দিকে যাত্রা করলো। সংখ্যায় এরা তিন থেকে চার হাজার। রবাতিক ঔচীনী পার হয়ে এগিয়ে গেল তারা আউজকিন্ট। বাবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে তারা সুলতান আহমদ তম্বল ও মীর্জার সহযোগী হলো।

সুলতান কুলী চুনাকের কাছে মুঘল বাহিনীর বিদ্রোহের খবর পেয়ে তাদের দমন করার জন্য কাশিম বেগকে পাঠালেন বাবর। তিনি জায়গামতো পৌছবার আগেই মুঘল বাহিনী সুলতান আহমদ তম্বল ও জহাঙ্গীর মীর্জার

সাথে যোগ দিল। তবু এগিয়ে গেল কাশিম বেগ। স্নাসি কিজিতের কাছে সিরের শাখা নদী আইলাইশ পার হলো। বিদ্রোহীরা তাদের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। তাদের বেপরোয়া আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না কাশিম বেগ। পরাজিত হলেন। ইব্রাহিম সারু, ওয়েইস লাঘরী, সৈয়দ কর প্রভৃতিকে নিয়ে অতি কষ্টে পালিয়ে এলেন। সুলতান আহমদ তম্বল মুঘল বাহিনী নিয়ে সমানে তাদের পিছু তাড়া ক'রে চললো। এগিয়ে এলো একেবারে অন্দিজান দুর্গের দুয়ার গোড়া পর্যন্ত। করলো অন্দিজান অবরোধ।

একমাসের মতো অবরুদ্ধ হয়ে রইলো রাজধানী অন্দিজান। বার বার চেষ্টা করেও কোন গুরুতর আঘাত হানতে পারলেন না সুলতান আহমদ তম্বল। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে, অবরোধ তুলে নিয়ে, এগিয়ে গেলেন আউশের দিকে। সেখানকার শাসনভার তখন ইব্রাহীম সারুর লোকজনদের উপর।

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য ও সমরসম্ভার সংগ্রহ ক'রে হিজরী ৯০৫ অব্দের মহরম মাসের ১৮ তারিখে (২৫শে আগষ্ট ১৪৯৯ খ্রীঃ) বাবর আউশ রক্ষার জন্য সেখানে যাত্রা করলেন। বাবর কাছাকাছি হতেই তম্বল তার বাহিনী নিয়ে উত্তরে রবাত-ই-সরহঙ্গ-এর দিকে সরে গেলেন। পরদিন বাবর যখন আউশের ভেতর দিয়ে শত্রুদের ধরার জন্য এগিয়ে চলেছেন তখন খবর পেলেন, তম্বল তাকে জোর ফাঁকি দিয়েছে। অতর্কিত আক্রমণ ক'রে অন্দিজান দখলের জন্য সে তার বাহিনী নিয়ে এই সুযোগে বাবরের দৃষ্টি এড়িয়ে সেদিকে ধাওয়া করেছে।

অন্দিজান পৌঁছে তম্বল শহর অবরোধ করলেন। শহরের সেনাবাহিনীও আগেভাগে খবর পেয়ে তৈরী হয়েই ছিল। দুর্গ রক্ষার জন্য বিক্রমের সঙ্গেই তারা লড়াই দিয়ে চললো।

এদিকে বাবর তম্বলের ভাই খলীলের কাছ থেকে মাডু দুর্গ অধিকার ক'রে নিলেন। তারপর ছুটলেন অন্দিজান, মুঘল বাহিনীর মুখোমুখি হবার জন্য। হলেন মুখোমুখি। প্রায় একমাস ধরে দু'বাহিনী সে অবস্থায় রইলো। প্রতিদিনই ছোটখাট সংঘর্ষ ঘটতে থাকলো। তম্বলের তুলনায় বাবরের সৈন্যশক্তি কম থাকার দরুন তিনি আক্রমণের বদলে প্রতিরোধাত্মক যুদ্ধ কৌশলধ রলেন। মোগল বাহিনীর অর্তকিত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ছাউনির চারিদিকে পরিখা খোঁড়া হলো। একমাসের কাছাকাছি এভাবে কাটার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য সাহায্য পেয়ে গেলেন তিনি। হিসার থেকে আপন

পরিবারের যোদ্ধাদের নিয়ে হাজির হলেন সুলতান আহমদ করাওয়াল। আউশ থেকে এলেন কম্বর আলি। এলো সুলতান আহমদের পাঠানো সেনাদল। বাবর এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। স্থির করলেন, এবার তিনি শত্রুর সঙ্গে বিধিবদ্ধ যুদ্ধে নামবেন। আপন বাহিনী নিয়ে শত্রু ছাউনির দিকে এগিয়ে গেলেন বাবর। কিন্তু কার সাথে যুদ্ধ করবেন? বাবরের শক্তি বৃদ্ধির খবর পেয়ে তম্বল আব-ই-খানে তার বাহিনীর তাঁবু, কম্বল, তলপি তলপা সব কিছু ফেলে কখন চুপি চুপি পালিয়ে গেছেন।

শত্রুর পিছু-ধাওয়া করলেন বাবর। খুবানে পৌছে, যুদ্ধার্থে সৈন্য সাজালেন। প্রচলিত তৈমুর বংশীয় রীতিই অনুসরণ করলেন। ডান, বাঁ, মধ্য ও অগ্রবাহিনী। ডানভাগে রইলেন আলী দোস্ত তঘাই তার দলবল নিয়ে। বাঁয়ে ইব্রাহীম সারু প্রমুখ। কাশিম বেগকে নিয়ে বাবর নিজে রইলেন মধ্যভাগে। আক্রমণের জন্য এগিয়ে গিয়ে খুবানের ডুমাইল দূরে সাকা গ্রামের কাছে শত্রুপক্ষেকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করলেন।

বাবরের সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে না পেরে জহাঙ্গীর মীর্জাকে নিয়ে সুলতান আহমদ তম্বল পালিয়ে গেলেন। বাবর লিখেছেন "এই-ই আমার জীবনে প্রথম বিধিবদ্ধ সংগ্রাম। সবার উর্ধে বিরাজিত ভগবান তার অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করে একে বিজয় ও গৌরবের দিনে পরিণত করলেন।" যারা বন্দী হয়েছিল, আলী দোস্ত তঘাইয়ের উপদেশমতো তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হলো। কিন্তু শত্রুদের পিছু তাড়া করা হলো না। এই মারাত্মক ভুলের মাশুল পরে তাকে ধারাবাহিক ভাবে গুনে যেতে হলো

কিছুকালের মধ্যেই বাবর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন তম্বল ধীরে ধীরে আবার বলশালী হয়ে উঠছে, ক্রমাগত রাজ্যের এখানে ওখানে হানা দিয়ে, গেরিলা যুদ্ধ ক'রে চলেছে। তিনিও নীরবে এ উৎপাত সয়ে, শত্রুকে আস্কারা দিয়ে যাবার লোক নন। বেরিয়ে পড়লেন আউশকিন্ট অভিযানে। তীব্র শীতের মধ্যেই রাবাতিক ঔচীনীতে গিয়ে ঘাঁটি গাড়লেন। এ সময়ে এখানে ঘাঁটি করার মূল লক্ষ্য ছিল শত্রুকে সংযত ক'রে তোলা ও পরে সুবিধামতো তাদের নির্মূল করা। এ অঞ্চলে যথেষ্ট ছোট ছোট বনাঞ্চল রয়েছে ও সেখানে শিকারযোগ্য পশু-পাখিরও অভাব নেই। খুদ-ই-বীদীকে শত্রু দমনে পাঠিয়ে তিনি তাই শিকার নিয়ে মেতে রইলেন।

খুদা-ই-বীরদী তম্বলকে আক্রমণ ক'রে কতক সৈন্যকে বধ ও বন্দী করতে

সমর্থ হলো। অন্যেরা গেল পালিয়ে। এরপর আউশ ও অন্দিজান দু'দিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের দমন করার চেষ্টা হলো। কিন্তু আংশিকভাবে শীতের প্রকোপের দরুন, আংশিকভাবে তম্বলকে আউজকিণ্ট থেকে বাইরে আনতে নাপারার ব্যর্থতার দরুন এতে কোন সুফল লাভ হলো না। আবার কম্বর আলীও এই শীতের মধ্যে বাবরের সঙ্গে থাকতে তার অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে চললেন, চলে যেতে চাইলেন তার নিজের জেলায়। বাধ্য হয়ে তাকে ও আরো কতক ব্যক্তিকে যাবার অনুমতি দিলেন বাবর। কম্বর ছিলেন সব থেকে বড়ো জেলার শাসনকর্তা, অনুগামীও সব থেকে বেশি, কিন্তু অত্যন্ত অস্থির-চিত্ত লোক। কম্বর চলে যাবার ফলেও অভিযানে সাফল্য লাভ সুদূর হয়ে গেল। অতএব সে আশা ও পরিকল্পনা ত্যাগ করে কয়েকদিন পরে তিনিও অন্দিজান ফিরে এলেন।

তম্বল এ সময়ে নানাস্থানে সাহায্য পাবার জন্য চেষ্টা ক'রে চলছিলেন। মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খান যে কোন সাহায্যপ্রার্থীকে নির্বিচারে সাহায্য করতে অভ্যস্ত জেনে তাকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন তম্বল। সফলও হলেন। যে ভাগনেকে এতকাল তিনি বিপদে আপদে সাহায্য ক'রে আসছিলেন, সেই বাবরের বিরুদ্ধেই তিনি তম্বলকে সাহায্য দিতে রাজী হয়ে গেলেন। তম্বলের কাকা আহমদ বেগ ও বড় ভাই বেগ তীল্‌ব উভয়েই ছিলেন মাহমুদ খানের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী। তাদের সহযোগিতাতেই এ সাহায্যলাভে সফল হলেন তম্বল।

মাহমুদ খানের কাছ থেকে এক সাহায্যকারী সেনাদল নিয়ে বড় ভাই বেগ তীল্‌ব নিজেই চলে এলেন ভাই সুলতান আহমদ তম্বলের কাছে। আর কালবিলম্ব না ক'রে তম্বল ফরঘানের সমতল ভূমিতে প্রবেশ ক'রে আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ সুরু করেদিলেন। সাহায্যের জন্য পাঁচ-ছয় হাজার সেনার আরো এক বাহিনীকে পাঠালেন মাহমুদ খান। এদের নেতৃত্বে রইলো তার নিজের ছেলে সুলতান মুহম্মদ ও তম্বলের কাকা আহমদ বেগ। তারা পরিকল্পনা নিলেন কাসান অবরোধ করার।

এই বেদনাকর ও উদ্বেগজনক খবর পেয়ে বাবর তাড়াতাড়ি সামান্য যা পারলেন সৈন্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে ছুটলেন অগ্রসী। শীতের মাঝামাঝি এ সময়। ঘন অন্ধকার রাত। সূঁচ ফোটানো শীত। তবু থামলেন না কোথাও। বন্দ-ই-সালারের মধ্য দিয়ে সারারাত বেপরোয়াভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে পরদিন সকালেই হাজির হলেন অগ্রসী। 'সে রাতে শীতের প্রকোপ এতো ভয়ংকর ছিল যে

হাতে পায়ে ক্ষত হলো কয়েকজনের, অনেকেরই কান ফুলে আপেলের আকৃতি নিলো।' অথসীতে প্রতিরোধ আয়োজন শেষ করেই ছুটলেন তিনি কাসান। এতটুকু বিশ্রাম নিলেন না। এখানকার নেতৃত্বে রেখে গেলেন য়ারক তঘাইকে।

বাবর কাসানের দিকে এগিয়ে আসছে শুনেই আহমদ বেগ ও সুলতান মুহম্মদ ভীত হয়ে পড়লেন। অবরোধ তুলে নিয়ে, একরকম লেজ গুটিয়েই প্রস্থান করলেন তাসকিন্টে।

বাবর অন্দিজান থেকে যাবার জন্য বার হয়েছেন জেনে আহম্মদ বেগ ও সুলতান মহম্মদকে সাহায্যের জন্য তম্বল ও কাসান ছুটে এলেন। কিন্তু একটু দেরিতে। এসে হতাশ হয়ে দেখলেন, তারা এর মধ্যেই পালিয়েছে। আর বাবর কাসান দুর্গে তাকে অভ্যর্থনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছেন। তম্বল কোনরকম ঝুঁকি নিতে সাহসী হলেম না। কাসান থেকে দু মাইল দূরেই দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। সেনাদল ক্লান্ত থাকা সত্বেও রাতের আঁধারেই তিনি পশ্চাত- [illegible] সুরু করলেন। বাবরের ইচ্ছা ছিল সে রাতেই তিনি অতর্কিত ভাবে [illegible]দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কতক বেগ অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তা আর হয়ে উঠলো না। তাদের যুক্তি ছিল—'এখন বেলা পড়ে গেছে। আজ যদি আমরা না যাই, কাল কী আর পার পাবে তারা? যেখানেই থাকুক, কাল ঠিক গিয়ে ধরবো তাদের।' কিন্তু সকালে দেখা গেলো, তম্বল সারারাত পিছু হটে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। সুতরাং তম্বলকে নির্মূল করার আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ বাবর হারালেন এভাবে। পিছু নিয়েও তাদের আর ধরা গেল না সে যাত্রা।

তম্বল পালিয়ে অর্চীয়ান দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। বাবরও সেখানে পৌঁছে অবরোধ করলেন দুর্গ। দু সপ্তাহ এমনি চললো।

ইতিমধ্যে মচম ও আউইঘুর গ্রামের প্রধান সঈদ য়ুসুফ দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ ক'রে বসলো। এ গ্রাম দুটি অন্দিজান শহরের কাছেই। সে মুঘল গোষ্ঠী ও উপজাতির কতক লোক নিয়ে সুলতান আমেদ তম্বলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে গেল। তম্বলকে খবর দিল অর্চীয়ান দুর্গ থেকে বাইরে চলে আসার জন্য। রাতের অন্ধকারে দুর্গ থেকে বার হয়ে তাদের সাথে যোগ দিলেন তম্বল। আশ্রয় নিলেন গিয়ে বাঁশখারান দুর্গে। দুই পক্ষের সৈন্য শিবির মধ্যে দূরত্ব খুবই অল্প। অতএব প্রতিদিন সংঘর্ষ ঘটে চললো।

১৫০০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। শত্রুরা প্রায় নির্মূল হবার পথে।

এমন সময় বাবর হতবাক হয়ে দেখলেন, তার সব থেকে দুই প্রভাবশালী আমীর আলী দোস্ত তঘাই ও কম্বর আলী সুলতান আহমদ তম্বলের সঙ্গে শান্তি আলোচনা জুড়ে দিয়েছে। তীব্র শীতের মধ্যে এই দীর্ঘস্থায়ী বিরক্তিকর অভিযান যে তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। তবু তাদের কাছ থেকে এরূপ আচরণ বাবর আশা করেননি। নিঃশেষপ্রায় শত্রুর সাথে এই শান্তি আলোচনায় বাবরের সায় না থাকলেও এই আমীরদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা চিন্তা ক'রে এদের ঘাঁটাতে সাহস করলেন না তিনি। অসহায় হয়ে তাদের কার্যকলাপ দেখে চললেন।

আসলে, সুলতান আহমদ তম্বলকে নির্মূল ক'রে জহাঙ্গীর মীর্জাকে নিজের তাঁবেতে আনার জন্য বাবরের এই ক্লান্তিহীন উদ্যম ও উৎসাহকে আমীররা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। মনে তাদের সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, বাবর ফরঘানের একচ্ছত্র আধিপত্য করায়ত্ত ক'রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন চালাবার পরিকল্পনায় রয়েছেন। অতএব নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন তারা। বাবর যাতে সর্বদা তাদের প্রভাবাধীন থাকতে বাধ্য হন, অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ না পান সেজন্য ভাইদের মধ্যে রাজ্য বিভাগের উপর জোর দিলেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, সির নদীকে মধ্য সীমানা ধরে নিয়ে উভয়ের মধ্যে রাজ্যভাগ হবে। নদীর উত্তরভাগে অবস্থিত অখসী, কাসান ও অন্যান্য অঞ্চল পাবে জহাঙ্গীর মীর্জা। দক্ষিণভাগে অবস্থিত অন্দিজান ও অন্যান্য অঞ্চল হবে বাবরের রাজ্য। তবে, সমরকন্দ উদ্ধার করতে পারলে অন্দিজানও ভাইকে ছেড়ে দিতে হবে। তাদের এ সিদ্ধান্তে বাবর মোটেই সায় দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তারা তাকে যে সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তাতে এ সিদ্ধান্ত না মেনে নিয়েই বা উপায় কী? অস্বীকার করা মানেই আমীরদের অভ্যুত্থানের সুযোগ ক'রে দেয়া। আবার রাজ্য হারিয়ে বনবাস জীবনে ফিরে যাওয়া। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থা মেনে নিলেন বাবর। সন্ধিপত্র রচিত হলো। জহাঙ্গীর মীর্জা ও তম্বল এসে বাবরের সাথে দেখা করলেন। শর্তাবলী অনুমোদিত হয়ে চুক্তি সমাধা হবার পর তারা চলে গেলেন অখসী। বাবর ফিরে এলেন অন্দিজান। অল্প কিছুদিনের মধ্যে যুদ্ধ বন্দীদেরও মুক্তি দিলেন উভয় পক্ষ।

মুঘল সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ ফলে দেখা দেয়া ঘটনাপ্রবাহের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু প্রভাবশালী আমীরদের ইচ্ছার কাছে বাবর যেভাবে

আত্মসমর্পণ করলেন তা আরেক জটিল অসহ পরিস্থিতির সূত্রপাত করলো। এ সাফল্যে আলী দোস্ত তঘাইয়ের চালচলন আচার ব্যবহারে বিরাট পরিবর্তন দেখাদিলো। অন্দিজানের শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ কার্যকলাপ শুরু ক'রে দিলেন। বাবরের ঘরোয়া কর্মচারীদের উপরও খাটাতে আরম্ভ করলেন আপন কর্তৃত্ব। বরখাস্ত করলেন নাজিমুদ্দীন খলীফাকে, আটক করলেন ইব্রাহীম সারু ও ওয়েইস লাঘরীকে, তাদের দেয়া জেলা কেড়ে নিয়ে চাকরী থেকে বিতাড়িত করলেন। কাসিম বেগকেও বাধ্য করা হলো অন্যত্র চলে যেতে। এই বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত আমীররা এতকাল বাবরের সবরকম দুঃখকষ্টের ভাগীদার হয়ে এসেছে। অসহ হলেও বাবর মুখ বুজে আলী দোস্ত তঘাইয়ের এ আচরণ সহ্য ক'রে চললেন।

কিছুদিন পরে দেখা গেল আলী দোস্তের ছেলে মুহম্মদ দোস্তও বাড়াবাড়ি সুরু ক'রে দিয়েছে। রীতিমতো রাজা-সুলভ চালচলন জুড়ে দিয়েছে সে। অভ্যর্থনা, ভোজসভা ও দরবার বসাতে আরম্ভ করেছে। এভাবে পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে রাজ্যের সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব ফলাতে থাকলেন। বাবরের মান-সম্মান ভাবমূর্তি যথেষ্ট খাটো হয়ে পড়লো। সতেরো বছরের তরুণ এই অসহায় অবস্থার মধ্যে একা কীই-বা করতে পারেন! মুখ বুজে সয়ে চললেন সব অবমাননা।

এই পরিবেশের মধ্যেই তার জীবনে আরেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটলো। বিবাহ। কনে, বড় জেঠা সুলতান আহমদ মীর্জার তৃতীয় কন্যা আয়েসা সুলতান বেগম। বাবরের যখন সবে পাঁচ বছর বয়স তখনই এ সম্বন্ধ ঠিক হয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমান মানসিক পরিস্থিতিতে এতে কোন শান্তি বা সুখ পেলেন না তিনি। নারী সঙ্গের প্রতি কোনরকম আকর্ষণ বোধ করলেন না। তার নিজের ভাষায় 'যদিও তার প্রতি আমার কোন বিরাগ মনোভাব ছিল না, তবু এ আমার প্রথম বিবাহ হবার দরুন সঙ্কোচ ও লজ্জা হেতু দশ, পনেরো বা কুড়ি দিনে একবার তার সাথে দেখা করতে যেতাম।'

এই বিবাহের কিছু কাল পরে তার জীবনে আরেকটি বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। নামের সামঞ্জস্য থেকে বাবুরী নামে একটি ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হলেন বাবর। এই আকর্ষণ গভীর প্রেমের রূপ নিলো। প্রকৃত প্রেম, ভালোবাসা বা আকর্ষণ কাকে বলে তা তিনি এতকাল জানতেন না। এই প্রথম তার উন্মেষ ও উপলব্ধি দেখা দিল তার মাঝে। বাবুরীকে দেখার জন্য তিনি তৃষিত হয়ে উঠলেও সামনা-সামনি হলে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠতেন, তার দিকে চোখ মেলে চাইতে

পারতেন না, কথা হারিয়ে ফেলতেন। বোধহয় এই ভালবাসাই তার মধ্যে প্রথম কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটায়। এ সময়ে বাবুরীকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি এ ধরনের একাধিক বয়েৎ রচনা করেন।

কেউ তো নয় যেমন আমি দীন ও দুঃখী, প্রেম-পিয়াসী
কোন্ প্রিয়া বা তোমার মতো এতো নিঠুর, রয় উদাসী॥

প্রেম ও ভাবোচ্ছ্বাসের জোয়ারে এক এক সময়ে তিনি এতো বিচলিত ও উন্মনা হয়ে উঠতে যে খালি পা খালি মাথায় শহরের পথে পথে বাগান বাগিচায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে এসব কবিতা উভয়কে নিকটতর ক'রে তোলে।

তবে এই প্রেম-উন্মাদনা বেশিদিন রইলো না। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের চাপে কিছুকালের মধ্যেই তিনি বাবুরীর কাছ থেকে দূরে ছিটকে পড়তে, তাকে ভুলে থাকতে বাধ্য হলেন।

সমরকন্দের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আবার তাকে সেখানে টেনে নিয়ে গেল। তরখানী আমীরদের হাতের পুতুল হয়ে রাজা সেজে থাকার করুণ পরিস্থিতি অতিক্রম করার চেষ্টা করতে গিয়ে সমরকন্দের সুলতান আলী মীর্জা মুহম্মদ মজিদ তরখান প্রমুখদের সাথে সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে বসলেন। আলী মীর্জাকে হটাবার জন্য কোমর বাঁধলেন তারা। প্রথমে চেষ্টা করলেন তার ছোট বৈমাত্রেয় ভাই, মোঙ্গল-প্রধানের আপন ভাগনে, ওয়েইস মীর্জা বা খান মীর্জাকে সিংহাসনে বসাতে। মোঙ্গল-প্রধান নিজেও ভাগনেকে এজন্য সবরকম মদত দিলেন। কিন্তু খান মীর্জার সাথেও মুহম্মদ মজিদ তরখানের বিরোধ দেখা দিল। তাকে বন্দী করার চেষ্টা করলেন খান মীর্জা। পালিয়ে গিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন মুহম্মদ মজিদ। এদিকে আলী মীর্জাও এই বিরোধের সুযোগে খান মীর্জাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ক'রে হটিয়ে দিলেন।

মুহম্মদ মজীদ তরখান এবার আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঝুঁকলেন বাবরের দিকে। আবদুল ওয়হাব শঘাওয়াল-এর ছেলে মীর মুঘলকে পাঠিয়ে বাবরকে সমরকন্দের সিংহাসনে বসার প্রস্তাব দিলেন। বাবরের নিজেরও তখন আলী মীর্জার মতোই প্রায় পুতুল অবস্থা। অন্যদিকে সমরকন্দ সব সময়েই তার আকাঙ্ক্ষার নগরী। সুতরাং এ সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। জহাঙ্গীর মীর্জার সাথে এক শান্তি চুক্তি ক'রে সাথে সাথে তিনি রওনা হলেন সমরকন্দ।

অন্দিজান থেকে অস্‌ফর যাবার পথে কাশিম বেগ ও তার অনুগামীরা তার সাথে যোগ দিলেন। পথে চলতে চলতে বাবর খবর পেলেন, জহাঙ্গীর মীর্জার

সাথে শান্তি চুক্তি সত্ত্বেও সুলতান আহমদ তম্বল তার রাজ্যে প্রবেশ ক'রে সব কটি দুর্গসহ অন্দিজান ও অন্যান্য অঞ্চল দখল ক'রে নিয়েছে। এ দুঃসংবাদ সত্ত্বেও বাবর পিছু ফিরলেন না। সমরকন্দ যাবার সিদ্ধান্তে অটল থেকে এগিয়ে চললেন। সমরকন্দের তুলনায় এক চিলতে অন্দিজান রাজ্য তার কাছে কিছুই না। খান-ই-য়ূর্তীতে পৌঁছলে মুহম্মদ মজীদ তরখান ও অন্যান্য সমরকন্দী বেগেরা তাকে সংবর্ধনা জানালেন। আলোচনা সূত্রে বাবরকে তারা জানালেন যদি তিনি খাজা য়াহিয়ার সমর্থন লাভ করতে পারেন তবে বিনাযুদ্ধে তার পক্ষে সমরকন্দ শহরে প্রবেশ সম্ভব হতে পারে। খাজা য়াহিয়া সেখানে বিশেষ প্রভাব-শালী, সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। বাবর দূত পাঠিয়ে তার সমর্থন লাভের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফল হলেন না। দর-ই-ঘম (খাল) পৌঁছে তিনি আবার লোক পাঠালেন খাজার কাছে। এবার গেলেন খাজা মুহম্মদ আলী। তিনি খাজার কাছ থেকে সমর্থন আদায়ে সফল হলেন। খাজা য়াহিয়া আশ্বাস দিলেন যে বাবর এলে তার হাতে শহর সমর্পণ করা হবে। উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে চললেন বাবর। স্থির করলেন দর-ই-ঘম খালের পাড়ে গিয়ে ছাউনি ফেলবেন। কিন্তু তার আগেই এক অঘটন ঘটে গেল। তার বিশ্বস্ত বেগদের অন্যতম সুলতান মাহমুদ তার দল ছেড়ে সরে পড়লেন। চলে গেলেন আলী মীর্জার কাছে। ফাঁস ক'রে দিলেন সব কথা। আলী মীর্জা সাথে সাথে সতর্ক পদক্ষেপ নিলেন। বিনা যুদ্ধে সমরকন্দ দখলের পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো।

নিরাশ হয়ে দর-ই-ঘম ফিরে এলেন বাবর। এখানে থাকা কালে তার পুরানো আমীর ইব্রাহীম সারু, মুহম্মদ য়ুসুফ প্রভৃতি এসে তার সঙ্গে যোগ দিলেন। প্রধান উজীর আলী দোস্ত এদের বিতাড়িত করেছিলেন। এ সময়ে এদের কাছে পেয়ে খুসী হলেন বাবর। কয়েকদিন পরেই আলী দোস্ত ও তার ছেলে বাবরের সাথে যোগ দেবার জন্য সেখানে এসে গেলেন। তাদের পুরানো শত্রুদের সেখানে দেখে চমকে গেলেন তারা। ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যাবার অনুমতি চাইলেন বাবরের কাছে। তারা আহমদ তম্বলের সঙ্গে যোগ দিতে পারে একথা জেনেও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বাবর চলে যাবার অনুমতি দিতে দ্বিধা করলেন না। তারা সত্যিই অন্দিজান ফিরে গিয়ে তম্বলের সাথে যোগ দিলে।

বাবর সমরকন্দ দখল করার আর কোন উদ্যম করার আগেই উজবেগ-প্রধান শইবানি খান সমরকন্দ আক্রমণ ক'রে বসলেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে সম্মুখ

সমরে এঁটে ওঠা দুরূহ দেখে আলী মীর্জা শহর মধ্যে আশ্রয় নিলেন। শহর অবরোধ করলেন শইবানি খান। এ সময়ে সমরকন্দ দখল করতে না পারলেও, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবার তিনি সেখানে এলেন। সমগ্র সমরকন্দ রাজ্য জয় ক'রে নিয়ে রাজধানী দখল করার জন্য এগোলেন। তার এই পুনরাগমন স্বয়ং আলী মীর্জার মায়ের গোপন আমন্ত্রণে।

অন্যদিকে খাজা য়াহিয়া বাবরকে শহরের অতি নিকটে এগিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। জানালেন, এর ফলে বাবরকে রাজা বলে ঘোষণা ক'রে তার হাতে শহর সমর্পণ তাদের পক্ষে সহজ হবে। কিন্তু বাবর সে প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। তিনি জোর দিলেন তারা আগে তার স্বপক্ষে অভ্যুত্থান করুক। তার সৈন্য ক্ষমতা খুবই কম। এতো অল্প সেনা নিয়ে তার পক্ষে, ভিন্ন রকম কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে, শহর অবরোধ কি ফটক ভেঙে প্রবেশ করা সাধ্যাতীত। যখন এ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে, বাবর খবর পেলেন, শইবানি খান দ্রুত রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। সুতরাং নিরাশ হয়ে পিছু হটলেন তিনি। সরে গেলেন কেশ।

কেশ-এ থাকাকালে বাবর খবর পেলেন শইবানি খান সমরকন্দ শহর দখল ক'রে নিয়েছেন। সুলতান আলী মীর্জা, খাজা য়াহিয়া ও তার ছেলেদের হত্যা করা হয়েছে। আলী মীর্জার মা, যিনি শইবানি খানের মহিষী হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই জুহর বেগি আঘাকে শইবানি খান তার রক্ষিতা হতে বাধ্য করেছেন। বাবরকেও সমরকন্দের সিংহাসনে বসার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে হলো। পাছে শইবানি খান এবার তাকে পিছু তাড়া করেন এই ভয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হিসার ছুটলেন। পথে মুহম্মদ মজীদ খান ও অন্যান্য সমরকন্দী বেগেরাও পরিবারবর্গকে নিয়ে তার সাথে যোগ দিলেন। চঘানীয়ান পৌঁছে তারা হিসার ও কুন্দুজের শক্তিশালী সুলতান খুসরাউ শাহের কাছে চাকরী নিলেন। বাবরের সঙ্গে এবার রইলেন মাত্র দুশো থেকে তিনশো অনুগামী। সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। এত অল্প অনুগামী নিয়ে কী ক'রে আর কোন সমরাভিযান করবেন? নিজের দেশ ও আপনজন থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এখন তিনি কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, কী করবেন?

খুসরাউ শাহের সীমান্ত এলাকা মধ্যেই ভবঘুরের মতো বাস ক'রে চললেন বাবর। এক এক সময় ভাবেন অন্দিজান ফিরে যাবেন, সেখানে গিয়ে আর

একবার ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। কখনো ভাবেন, ছোট মামা আহমদ খানের কাছে চলে যাবেন। কিন্তু কোনটিই করলেন না। করা সম্ভবও ছিল না। অন্দিজানে তম্বল ও জহাঙ্গীর এখন মোটামুটি শক্তিশালী। আহমদ খানের রাজ্যও অনেক দূরে। অতএব, হিসারের উত্তর-পশ্চিম দিককার সুউচ্চ পর্বতমালা ডিঙিয়ে কামরুদ উপত্যকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি! এ সময় শের আলী এবং কুচ বেগও তার সঙ্গ ছেড়ে হিসার চলে গেলেন। যাবেই তো। কজনে কার দুঃসময়ের সঙ্গী হতে চায়? সুতরাং সেজন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস না ফেলে এগিয়ে চললেন বাবর। দুর্গম গিরিমালা পার হয়ে পৌঁছলেন এসে সর-তাক গিরিপথের কাছে। ততক্ষণে আরো অনেকে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সেই ভয়ংকর গিরিপথ অতিক্রম করার জন্য অকল্পনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হলো তাকে। চরম দুঃখ কষ্ট স্বীকার ক'রে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হলেন তিনি ফান।

বাবর আশা করেছিলেন ফানের শাসক তাকে সাদর অভ্যর্থনা করবেন, আতিথেয়তা দেখাবেন। যেমনটি ইতিপূর্বে তিনি দেখিয়েছেন মসুদ মীর্জা, সুলতান হুসেন মীর্জা বা বৈশুজ্ঘর মীর্জার প্রতি। কিন্তু না। তিনি তার জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়া পাঠালেন। দেখাও করলেন না বাবরের সাথে। খুসরাউ শাহ-ও একই আচরণ করলেন। বাবর ক্ষুব্ধ হলেন, তার পৌরুষ জ্বলে উঠলো। আপন ক্ষমতায় আপন ভাগ্যকে জয় করার জন্য অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলেন তিনি।

ফানে এসে খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন সমরকন্দ বর্তমানে একপ্রকার অরক্ষিত অবস্থায় আছে। শইবানি খানের কর্মচারীরা সকলেই শহর ছেড়ে বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে গেছেন। অতর্কিতভাবে সমরকন্দ আক্রমণের এ এক বিরাট সুযোগ। অতএব দুঃসাহসীর মতো সেই পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলেন। দুঃখ, কষ্ট, অপমান, দলত্যাগ কোনটাই তাকে সে সংকল্প থেকে চ্যুত করতে পারলো না। হাজির হলেন বাবর সমরকন্দের নিকটবর্তী কেশতুদ শহরে। উজবেগদের কাছ থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে এটি ছিনিয়ে নেবেন, এই বাসনা। কিন্তু পৌঁছে দেখলেন শহরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, নির্জন অবস্থায় পড়ে আছে। অতএব আরো এগিয়ে চললেন। রবাত-ই-খাজা আক্রমণের জন্য পাঠালেন কিছু সঙ্গী সহ কাশিম কুচীনকে। নিজে গেলেন য়ার-ই-ঈলাক। কাশিম কুচীন তার সঙ্গীদের নিয়ে মই বেয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করলেন। কিন্তু আগে থেকে খবর পেয়ে সতর্ক হয়েই ছিল

দুর্গের সেনারা। সুতরাং পালাতে বাধ্য হলেন তারা। যোগ দিলেন এসে আবার বাবরের সাথে।

এই য়ার-ই-ঈলাকেই তার সাথে যোগ দিলে কম্বল আলি ও আরো কতক দেশ-ত্যাগী। আবুল কাশিম কোহবুর এবং ইব্রাহীম তরখানও তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করলেন। বাবর উদ্দীপিত হয়ে এগিয়ে গেলেন। পৌঁছলেন য়ার-ই-ঈলাকের একটি গ্রাম আসফিদিকে। এ সময়ে তার সঙ্গে মাত্র ২৪০ জন অনুগামী।

সুলতান আলী মীর্জা ও খাজা য়াহিয়াকে হত্যার জন্য ও আলী মীর্জার মায়ের প্রতি অপমানকর ব্যবহারের জন্য সমরকন্দের অধিবাসীরা শইবানি খানের প্রতি ক্ষেপেই ছিলো। অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে সমরকন্দ জয় সহজ হবে বুঝে নিজ পরিকল্পনা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিলেন বাবর। অনুগামী ও সমর্থকেরাও তার সিদ্ধাতে সায় দিলেন।

এ সময়ে তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে পরম শ্রদ্ধেয় খাজা উবায়েদুল্লাহ্ আহরারী তার কাছে এসেছেন। তাকে যেন বলছেন—'সমরকন্দ দেয়া হলো তোকে।' এ স্বপ্নও তার মনোবল বাড়িয়ে তুললো। তাকে আরো উদ্দীপ্ত ক'রে তুললো।

এই ঘটনার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিনাযুদ্ধে সমরকন্দ দখল করলেন তিনি।

॥ সাত ॥

পতন ও অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়ে অসমসাহসিক নিরলস বাবর আবার আলোর ঝিকিমিকি দেখতে পেলেন। দ্বিতীয়বার তার স্বপ্নের নগরী সমরকন্দের সিংহাসনে বসলেন তিনি।

প্রেমিক গুহার কাছ থেকে মই বেয়ে তার দলের ৭০-৮০ জন লোক গোপনে শহর মধ্যে প্রবেশ ক'রে তারকোইজ ফটক দখল ক'রে নিলে। ভেঙে ফটক খোলা হলো। সেই ফটক দিয়ে তিনি অবশিষ্ট দলবল নিয়ে শহর মধ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে তখন তার মাত্র সেই ২৪০ জন বিশ্বস্ত অনুগামী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সাহায্যকারীরাও তার সাথে যোগ দিলেন। শহরবাসীরাও উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দের সাথে তার পুনরাগমনকে সমর্থন জানালো। ঘটনার গতি লক্ষ্য ক'রে শইবানি খানও তার কাছে সে সময়ে থাকা অতি অল্প সৈন্য নিয়ে বাবরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেন না। নিঃশব্দে শহর ছেড়ে প্রস্থান করলেন। বাবর উঠলেন গিয়ে বু-স্তান প্রাসাদে। জনগণের আনন্দ উৎসবের মধ্যে তিনি সিংহাসনে বসলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য রচিত হলো প্রশস্তি গীতি। প্রচলিত হলো একটি নতুন অব্দ।

বাবর সংকল্প নিলেন, এবার আর আগের মতো ভুল করবেন না তিনি। যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন শেষ পর্যন্ত সমরকন্দ আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। এ সংকল্প তখন তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। পিতৃরাজ্য অন্দিজান তো তার হাত থেকে চলে গেছে। সুতরাং সমরকন্দই এখন তার একমাত্র আশ্রয়, বল-ভরসা। এখানে শিকড় গেড়েই তাকে এবার সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন সার্থক করতে হবে।

কিন্তু একাজ মোটেই সহজ ছিল না। হলোও না সহজ। বুখারা ও তার সন্নিহিত এলাকা তখনও শইবানি খানের দখলে। সমরকন্দ রাজ্যের এই অংশই তুলনামূলক ভাবে অধিক সুজলা সুফলা। জনবসতিও এখানেই অধিক। খাদ্য ও সেনা দুইই এখানে সহজলভ্য। চতুর সমরাভিজ্ঞ বিচক্ষণ শইবানি খান তাই সমরকন্দ থেকে সরে গিয়ে সেখানে ঘাঁটি গেড়েছেন। শীতের অবসান হয়ে বসন্তের আবির্ভাব হতেই তিনি তার সামরিক ক্রিয়াকলাপ সুরু ক'রে দিলেন! অধিকার ক'রে নিলেন করাকুল। নিলেন দাবুসী।

বাবরের পক্ষে আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হলো না। তিনি বুঝলেন

পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ ছাড়া শইবানি খানকে হটানো, সমরকন্দকে নিজের মুঠোয় ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শইবানি খানের তুলনায় নিজেকে দুর্বল জেনেও সেজন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। সাহায্যের জন্য বড়ো মামা মাহমুদ খান ও অন্যান্যদের কাছেও অনুরোধ জানালেন। ১৫০১ অব্দের এপ্রিল-মে মাস নাগাদ (হিজরী ৯০৬) তিনি তার বাহিনী নিয়ে শামুকের গতিতে বুখারার দিকে এগিয়ে চললেন।

সর-ই-পুল অতিক্রম ক'রে সৈন্য ছাউনি ফেললেন তিনি। চারপাশে ডালপালা দিয়ে ঘন ক'রে বেড়া দিয়ে, পরিখা খুঁড়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত ক'রে সতর্ক ভাবে অপেক্ষা ক'রে চললেন।

শইবানি খানও অন্যদিক থেকে এগিয়ে এসে খাজা কার্দজানে শিবির করলেন। দু-পক্ষের শিবির মাঝে মাত্র ৪।৫ মাইলের ব্যবধান। নিয়মিত সংঘর্ষ ঘটে চললো। রাতের অন্ধকারে সহসা ছাউনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবরকে কাবু করার চেষ্টাও করলেন শইবানি খান। কিন্তু বাবর তো আগে থেকেই সেজন্য সতর্ক। অতএব সে চেষ্টা তার সার্থক হলো না।

বিধিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ সমরের সংকল্প নিয়ে সে ভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন বাবর। শইবানি খানকে হটিয়ে দেবার জন্য তিনি অধীর। উনিশ বছরের তরুণ তার উষ্ণরক্ত নিয়ে বেশি দিন চুপচাপ থাকতে পারলেন না। সংগ্রামের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠলেন। জ্যোতিষীদের সিদ্ধান্তও এতে ঘৃতাহুতির কাজ করলো। তাদের মতে বিশেষ নির্দিষ্ট একটি তারিখের পর শুভ সময় পার হয়ে যাচ্ছে। এদিকে বাকী তরখান তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছেন একহাজার থেকে দু' হাজার সৈন্য নিয়ে। এগিয়ে আসছেন তার বড়োমামার পাঠানো এক থেকে দু' হাজারের মতো সেনাদল সৈয়দ মুহম্মদ মীর্জা দুঘলাতের নেতৃত্বে। কিন্তু জ্যোতিষীদের বচনে প্রভাবিত হয়ে তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বসলেন। মামার পাঠানো সৈন্যদল তখন মাত্র কয়েক ঘন্টা দূরে। তরখানের সৈন্যেরা দুদিনের পথ দূরে।

এই বাস্তব দূরদর্শিতা বর্জিত পদক্ষেপ বিপর্যয় ডেকে আনলো। অসম সাহস ও সংকল্প নিয়ে পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও বাবর শেষরক্ষা করতে পারলেন না। অভিজ্ঞ সমরনায়ক শইবানি খানের বিচক্ষণতা ও উন্নত রণকৌশলের কাছে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হলো তাকে। মাত্র দশ পনেরো জন সঙ্গী নিয়ে ভরা জল খরস্রোতা কোহিক নদী ঘোড়া সাঁতরে পার হয়ে, কোনমতে প্রাণ নিয়ে সমরকন্দে পালিয়ে এলেন।

কোহিক নদীতীরের এই যুদ্ধ সাময়িকভাবে বাবরের জীবনে গভীর বিপর্যয় ডেকে এনেছিল সন্দেহ নেই। তবু এই যুদ্ধ ও তার পরবর্তী বিপর্যয়ের গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছিল এক নতুন বাবর। যে বাবর মানুষ হিসাবে অনেক পূর্ণতর, অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, যিনি পৃথিবীর ক্রীড়াঙ্গনে নিষ্ঠ খেলোয়াড়ের মতোই আপন ভূমিকা পালন করতে শিখেছিলেন, বরণ ক'রে নিতে শিখেছিলেন হার-জিত, পতন-উত্থান, ব্যর্থতা ও সাফল্যকে প্রকৃত খেলোয়াড় সুলভ মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। শিখেছিলেন বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে।

শইবানি খানের উন্নত রণকৌশল চলিঙ্গু কামানের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে সচেতন ক'রে তুললো। শিক্ষা পেলেন জ্যোতিষ, দৈবানুগ্রহ বা অলৌকিকতার উপর অন্ধ-বিশ্বাস না রেখে বাস্তব বিচার-বিশ্লেষণ-নির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার দিকে।

বাবরের একরকম পিছু পিছু শইবানি খানও সমরকন্দ এলেন। অবরোধ করলেন শহর। সংকটের গভীর সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকলেন বাবর। সমগ্র রাজ্য এখন উজবেগদের দখলে। বাইরে থেকে শহরে খাদ্য জোগানের সব পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছেন চতুর শইবানি খান। সমরকন্দ এবার যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। তবু অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে প্রতিরোধ ক'রে চলার সংকল্পে অটল রইলেন বাবর। সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন বড়োমামার কাছে। তৈমুর বংশীয় অন্যান্য সুলতানদের কাছে।

সাহায্য এলো না। যে বড়োমামা বার বার তাকে সাহায্য করেছেন তিনিও এবার মুখ ফিরিয়ে রইলেন। বোধ হয় বাবরের বেহিসাবী পদক্ষেপ তাকে বিরক্ত ও হতাশ ক'রে তুলেছিল। কিংবা বাবরের পতন অনিবার্য বুঝে তিনি আর হাঁটু ভাঙা ঘোড়ার পিছে বাজী ধরা অর্থহীন বলে মনে করলেন। খুরাসানের রাজা, কাকা, সুলতান হুসেন মীর্জা বঙ্গকরাও রইলেন মুখ ঘুরিয়ে। শুধু তাই নয়, পরাক্রমশালী শইবানি খানের সাথে শত্রুতা এড়াবার জন্য তিনি তার মনোভাবের কথা যেচে জানিয়ে দিলেন তাকে।

পাঁচ মাস অবরুদ্ধ হয়ে রইলো সমরকন্দ।* বাবরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে

---

* গুলবদন বেগমের হুমায়ুন-নামা অনুসারে ছমাস। Vamberyর মতে চার মাস (History of Bokhara, p. 256)।

শহরবাসীরাও সমানে প্রতিরোধ করে চললো উজবেগদের। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কেউই তারা চাইছিলো না শইবানি খানকে। কিছুদিনের মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়ালো, 'গরীব ও অনাথ শ্রেণীর মানুষেরা বাধ্য হয়ে কুকুর ও গাধার মাংস খেতে সুরু করলে। শস্যাভাবে ঘোড়াদের গাছের পাতা খাওয়ানো হতে থাকলো। অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেলো মালবেরী ও এল্‌ম পাতাই এ ব্যাপারে সব থেকে উপযোগী। অনেকে শুকনো কাঠ কুচি কুচি ক'রে জলে ভিজিয়ে তাই খাওয়াতে আরম্ভ করলে।'

প্রথমে শইবানি খান শহরের খাদ্য-দুর্দশার কথা অনুমান করতে পারেননি। পরে যখন তা জানতে পেলেন ও বাবরের বিচ্ছিন্ন অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পারলেন, অবরোধ ক্রমশঃ তীব্রতর ক'রে চললেন তিনি। সংকট এমন একটি চরম বিন্দুতে পৌঁছল যার পর প্রতিরোধ অর্থহীন। এতএব খেলোয়াড়ের মতো পরাজয় স্বীকার ক'রে নেবার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হলেন বাবর।

সুরু হলো শান্তি আলোচনা। জীবনীতে বাবর লিখেছেন শইবানি খানই প্রথম এ প্রস্তাব দেন। শইবানি খানের কাছ থেকে এ সময়ে এ রকম প্রস্তাব যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাই ঐতিহাসিকেরা এক্ষেত্রে বাবরকে মিথ্যা-ভাষণের দায়ে দায়ী ক'রে থাকেন। কিন্তু, আমার মতে, এরূপ একটি সাধারণ বিবরণ ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, তাকে মিথ্যা ভাষণের দায়ে দায়ী করলে তার অনন্য জীবনীগ্রন্থখানির মর্যাদাকেই ক্ষুণ্ণ করা হয়। স্বভাবতঃই সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয়, অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যিনি মিথ্যা বলেছেন, সমগ্র বিবরণীতে তিনি না জানি কতো মিথ্যাই বলেছেন, রঙ চড়িয়েছেন। কিন্তু বাবর তার জীবনীর ছত্রে ছত্রে যে ইতিহাস-চেতনার প্রখর পরিচয় রেখে গেছেন, সত্য ভাষণের চমকপ্রদ নিষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন, তাথেকে এ অভিযোগ করা চলে না। তার সম্পর্কে বড় জোর এ কথাই বলা যায় যে যেখানে তিনি সত্য গোপন করতে চেয়েছেন সেখানে সে বিষয়ে তিনি নীরব থেকে গেছেন কিন্তু মিথ্যা বলে তাকে বিকৃত করেননি।

যাই হোক, শেষ অবধি একটি শান্তি চুক্তিতে পৌঁছলেন দুই পক্ষ। শহর ও দুর্গ শইবানি খানের হাতে সমর্পণ ক'রে এক মধ্যরাত্রের কাছাকাছি অনুগামী ও পরিবারবর্গকে নিয়ে সমরকন্দ ত্যাগ করলেন বাবর। এই শহর ত্যাগ কালে তার বড় বোন খানজাদা বেগম পড়লেন শইবানি খানের হাতে। ('[redacted] ৯০৩, মার্চ ১৪৯৮)।

এক্ষেত্রেও বাবরকে মিথ্যা ভাষণের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। ঐতিহাসিক

মীর্জা হায়দার দুঘলাত এবং গুলবদন বেগমের বিবরণ অনুসারে তিনি বড় বোন খানজাদা বেগমকে শইবানি খানের হাতে সমর্পণ ক'রে শান্তি ক্রয় করেছিলেন। এখানেও পূর্ব প্রদর্শিত কারণে আমি বাবরের বিবরণ মেনে নেয়ারই পক্ষপাতী।

এই বিয়োগান্তক দৃশ্যেও তার চোখে অশ্রু বা বিষাদের ছায়া দেখা গেল না। একটুকু ভেঙে পড়লেন না তিনি। প্রতিটি খেলায় হার বা জিত একটা তো আছেই, এই খেলোয়াড়ী মেজাজ নিয়েই ঈলান-ঔতির দিকে এগিয়ে চললেন তিনি। এখন তার কোন রাজ্য নেই, নেই রাজধানী বা রাজকীয় মর্যাদা। আবার বিগত দিনগুলির মতোই তিনি হয়ত পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন। উচ্চাসীন ব্যক্তিরা অবহেলার চোখে তাকে দেখবে, দেবেনা কোন মর্যাদা। কিন্তু কী আসে যায় তাতে? কিংবা, আবার একটা খেলায় জিতে নাম ভূমিকায় ফিরে আসতেই বা কতক্ষণ? আর জীবন তো শেষপর্যন্ত অসংখ্য হারজিতের সমষ্টি, অগণিত সাফল্য-অসাফল্যের যোগফল। অতএব উজ্জ্বল আশাবাদী বাবর পরদিন সকালে নির্মোহ চিত্তে পথ চলতে চলতে কাশিম বেগ ও কম্বর আলীর সাথে ঘোড়া ছোটাবার পাল্লা জুড়ে দিলেন। দু'জনকে পিছে ফেলে আগে আগে ছুটতে ছুটতে বার বার পিছু ফিরে অন্য দুই প্রতিযোগীকে দেখতে গিয়ে একসময়ে জিনটা খসে যাবার দরুন গেলেন উলটে পড়ে। লাগলো মাথায় চোট। সারাদিন ভোঁ ভোঁ ক'রে চললো মাথা। মনে হতে থাকলো যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কল্পনার মধ্য দিয়ে আচ্ছন্নের মতো গতি ক'রে চলেছেন। ক্রমশ কেটে গেল এ অবস্থা। বিকালের দিকে ঈলান-ঔতিতে এসে পৌঁছলেন। সাথে খাদ্য নেই। অগত্যা হত্যা করা হলো একটি ঘোড়াকে। তাকে রোস্ট ক'রে তাই খেলেন সকলে। একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর আবার যাত্রা সুরু করা হলো। সারা রাত ধরে চললো অবিরাম পথচলা।

পরদিন সকালে পৌঁছলেন এসে দীজাক। এখানকার শাসক হাফিজ মহম্মদ দুলদাইয়ের ছেলে তাহির সাদর আপ্যায়ন জানালেন তাকে। তিন চারদিন সেখানে কাটিয়ে রওনা হলেন আউরাটীপার দিকে। পথে থামলেন এসে পাশঘর। আউরাটীপা পৌঁছে দেখা করলেন মহম্মদ হোসেন মীর্জা দুঘলাতের সাথে। শীতকালটা কাটাবার জন্য একটু আশ্রয় চাইলেন। আউরাটীপার কাছে দিখ-কত গ্রামটি দিলেন দুঘলাত এজন্যে তাকে।

দিখ-কতে তল্পিতল্পা রেখে বাবর বড়োমামা ও তার পরিবারবর্গের সঙ্গে

দেখা করার জন্য তাসকিণ্ট যাত্রা করলেন। শীতকালটা সসম্ভ্রমে কাটাবার জন্য একটি জেলা বা পরগণা লাভের আশায় প্রভাবিত ক'রে চললেন তাকে। সুলতান কথা দিলেন, এজন্য আউরাটীপা দেবেন তাকে। কিন্তু সেখানে ফিরে তুঘলাতের কাছে শহর অর্পণের দাবী জানাতে তিনি তাতে আপত্তি জানালেন। সমরকন্দের নিকটবর্তী এলাকায় আউরাটীপার মতো একটি সুফলা ও সমৃদ্ধ জেলা পেলে বাবর আবার সমরকন্দ জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে সামরিক কার্যকলাপ জুড়ে দেবে এই আশঙ্কা থেকেই বোধ হয় মাহমুদ খান ও তুঘলাত বাবরের হাতে এ অঞ্চল অর্পণে পিছিয়ে গেলেন।

অগত্যা তুঘলাতের কাছে দিন কয়েক কাটিয়ে দিখ-কত ফিরে গেলেন বাবর। আউরাটীপার পাহাড়ী এলাকায় দিখ-কত পরগণাটি অবস্থিত। তজিক উপজাতির লোকদের বাস এখানে। তুর্কীদের মতোই চাষবাস ও মেষপালন এদের জীবিকা। প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো মেষ রয়েছে এদের। অল্পদিনের মধ্যেই বাবর এদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গেলেন। রাজকীয় অভিমান ও আভিজাত্য বোধ ত্যাগ ক'রে সাধারণ মানুষের মতোই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রে চললেন। ঠাঁই নিলেন গাঁয়ের এক সর্দারের কুটিরে। অনুগামীরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস ক'রে চললেন চাষী আর মেষপালকদের ঘরে।

দীর্ঘ ঝড়-ঝঞ্ঝা-অশান্তির পর কী অপূর্ব শান্ত-সমাহিত শান্তির জীবন! অভিভূত হয়ে গেলেন বাবর। কুটিল, স্বার্থপর, কুচক্রী ক্ষমতালোভীদের পরিমণ্ডল থেকে সহজ-সরল স্বাভাবিক মানুষের পরিমণ্ডল মধ্যে এসে জীবনে এই প্রথম অনাবিল সুখ-শান্তির স্বাদ পেলেন তিনি। ডুবে রইলেন তারই মাঝে।

সর্দার আর তার থুনথুনে বুড়ী পিতামহী তাকে প্রায়ই শোনাতো তৈমুরের ভারত অভিযানের যতো কাহিনী। বুড়ী তখন একশো-এগারো বছরে পা দিয়েছে। তার কতক নিকট-জন নাকি তৈমুরের অভিযানে তার সাথী হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে শোনা কাহিনী তখনো ভোলেনি সে। সুযোগ পেলেই তা বাবরকে সে শোনাতো। সে রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে শুনতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন বাবর। কল্পনায় ভেসে চলে যেতেন ভারতে, হিন্দুস্তানে। এমনি করেই তার মনে অংকুরিত হলো ভারতে সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন।

বাবরের কতক অনুগামী এ সময়ে অত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা ক'রে আসার

জন্য অন্দিজান যেতে চাইলেন। কাশিম বেগ এই অবসরে বাবরের কাছে প্রস্তাব করলো জহাঙ্গীর মীর্জা ও আহমদ তম্বলের সাথে সুসম্পর্ক রচনার এক উদ্যম নেয়ার জন্য। এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন বাবর। সদিচ্ছার নিদর্শন রূপে উপহার পাঠালেন তাদের কাছে। জহাঙ্গীর মীর্জার কাছে আরমিনের (ermine) লোমে তৈরী একটি টুপী। তম্বলকে পাঠালেন একটি বড়ো তরবারী। বাবর সরস ভঙ্গীতে লিখেছেন : 'পরের বছর এই তরবারীখানিই আমার মাথা নেয়ার জন্য ঘাড়ের কাছে নেমে এলো।' সুসম্পর্ক রচনার এ উদ্যম কোন ফল দিল না। তাদের কারো কাছ থেকেই কোন সাহায্য সহায়তা এলো না। উলটে তার দৈন্যর চাপ বাড়াতে হাজির হলেন এসে অন্যান্য পরিবারবর্গকে নিয়ে মাতামহী অইসান দৌলত বেগম। সাথে নিয়ে এলেন তিনি আরো কতক অনাহার-ক্লিষ্ট অস্থিচর্মসার অনুগামীকে। তাদের ঠাঁই দেয়ার জন্য বাবর এবার বাধ্য হলেন নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বার হতে।

এদিকে সমরকন্দকে আপন রাজ্যের রাজধানী করলেন শইবানি খান। সেখানে নিজের স্থিতিকে সুদৃঢ় ক'রে নজর দিলেন এবার সুলতান হুসেন মীর্জা বঈকরা ও সুলতান মাহমুদ খানের রাজ্যের দিকে। শীতকালেই তাসকিন্ট অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে বড়োমামাকে সাহায্যের জন্য নিজের অনুগামীদের নিয়ে ছুটলেন বাবর। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তার আসার আগেই অভিযান অসমাপ্ত রেখে সমরকন্দ ফিরে গেছেন শইবানি খান। প্রবল শীতের মধ্যে অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে দিখ-কত ফিরে এলেন বাবর। কয়েকজন হিমে মারা গেলেন পথে।

বসন্তকাল দেখা দিতেই শইবানি খান আবার অভিযানে বার হলেন। এবারের লক্ষ্য আউরাটীপা। দিখ-কত পাহাড়মালার গোড়ায় নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। অতএব নিরাপত্তার জন্য বাবর সেখান থেকে সরে গেলেন। আব-বুরদান গিরিপথ পার হয়ে আশ্রয় নিলেন গিয়ে পাহাড়ী এলাকা মচাতে। সময় কাটাতে থাকলেন কবিতা রচনা ক'রে, কবি মৌলানা হিজরীর সুন্দর সুন্দর রচনা শুনে। বাবুরীর প্রেমে পড়ে বাবরের মধ্যে যে কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল, তা বিকাশিত হয়ে উঠেছিল সম্ভবতঃ এ সময়ে হিজরীর সান্নিধ্যে এসে।

অলস শুয়ে-বসে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সময় কাটাতে আর ভালো লাগল না কর্ম-প্রাণ বাবরের। এভাবে ঘর-বাড়ি-রাজ্য-আবাসহীন হয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে কর্মহীন দিন কাটানোর মধ্যে তিনি কোন পৌরুষ, কোন গৌরব, কোন সার্থকতা

খুঁজে পেলেন না। নতুন কোন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উত্তাল হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন, যাবেন এজন্য মামা মাহমুদ খানের কাছে, তার সাহায্য লাভের জন্য। গেলেনও।

এ সময়ে সুলতান আহমদ তম্বল মোঙ্গল-প্রধানের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রথমে তাসকিণ্ট অভিযানে বেরিয়ে 'কামারের উপত্যকা' পর্যন্ত এগোলেন। এর কিছুদিন পরে আবার তিনি আউরাটীপা অভিযান করলেন। মোঙ্গল-প্রধান মাহমুদ খানও এবার তম্বলকে হটিয়ে বাবরকে অন্দিজানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নড়েচড়ে বসলেন। সেনাবাহিনী নিয়ে বার হলেন তিনি। ধীরে সুস্থে শামুকের মতো এগিয়ে খুজন্দ নদীও অতিক্রম করলেন। কিন্তু এর ঠিক পরে পরেই খান কুলী, সুলতান মহম্মদ, ওয়েইস ও আহমদ-ই-কাশিম কোহবুর বাবরের পক্ষ ছেড়ে সুলতান আহমদ তম্বলের সাথে যোগ দিল। এ ঘটনার পর আর এগিয়ে যাওয়া অর্থহীন ভেবে মাহমুদ খান তাসকিণ্ট ফিরলেন। তার এই প্রেরণা-শূন্য নিষ্ফলা উদ্যম মোটেই খুশী করলো না বাবরকে। তিনি তার অননুকরণীয় ভঙ্গীতে লিখেছেন: 'এ নেহাতই এক অর্থহীন উদ্যম। কোন দুর্গ দখল করলেন না তিনি, আঘাত হানলেন না একজন শত্রুর উপরেও। শুধু তিনি গেলেন আর ফিরে এলেন।'

বড়োমামার আচরণ বাবরকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুললেও তিনি এখন অসহায়। তার দয়া ও পৃষ্ঠপোষকতাই এখন তার একমাত্র ভরসা। তাকে আশ্রয় ক'রেই বাবরকে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং ধৈর্য ধরে সময় ও সুযোগের অপেক্ষা ক'রে চললেন তিনি। সময় কাটিয়ে চললেন কবিতা ও গান রচনা ক'রে, কাব্য পাঠ ক'রে। জীবনী মধ্যে সগৌরবে তিনি জানিয়েছেন যে এ সময়েই (তম্বলের বিরুদ্ধে বড়-মামার নিষ্ফলা অভিযান কালে) তিনি তার প্রথম গজল রচনা করেন। এ গজলটির সুরু হয়েছে এভাবে:

মন, এ আমার মন, তাকে ছাড়া নির্ভর সাথী
মেলেনি তো আর কোন জন।
কাছেতে টানার পাইনি দোসর কোন আর
শুধু মন, এ আমার মন॥

আশা-আকাঙ্খা, চেতনা, দর্শন, সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি এ সময়ে মানসিক ভাবে অন্যদের চেয়ে কতো পৃথক ও একাকী হয়ে পড়েছিলেন, তার কাছের মানুষ ও জীবন-পরিমণ্ডল তাকে কতো ব্যথিত ক'রে তুলেছিল এ রচনার

মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে। নিষ্ক্রিয় হয়ে এভাবে বসে থাকতে আর তার ভাল লাগলো না। যদি কিছুই তিনি না করতে পারবেন, তবে এখানে এভাবে কাল কাটানোর চেয়ে পৃথিবীর জনারণ্যে মিশে, হারিয়ে যাওয়াই তো ভালো। স্থির করলেন চীন ভ্রমণে যাবেন। ছোটবেলা থেকেই চীন দেখার ইচ্ছা। কিন্তু বাঁধন আর সিংহাসন তা হতে দেয়নি। সিংহাসন নেই। বাঁধন থাকলেও সেজন্য দায়িত্বের পিছুটান নেই। মা এখন তার ভাইয়ের কাছে। সমস্যা শুধু, কী ক'রে আত্মীয়দের সম্মতি আদায় করবেন। তারা তাকে বোঝেন না, বোঝার চেষ্টাও করেন না। তারা তার মনের ভাবকে মাত্র একটি মানদণ্ড দিয়েই বিচার করেন। বুঝি আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি হলো, তাই বাবর একথা বলছে।

অতএব বাবর এক চাল চাললেন। খাজা আবুল মকারম মাধ্যমে তিনি শাহ বেগম (সৎ-মাতামহী) ও মাহমুদ খানকে বোঝালেন যে শইবানি খান ক্রমেই যেরূপ শক্তিশালী হয়ে উঠছে তাতে সে শুধু তুর্কীদের পক্ষে নয়, মুঘলদের পক্ষেও বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সুতরাং মাহমুদ খান ও আহমদ খান দু-ভাইয়ের উচিত, যৌথ পদক্ষেপ নিয়ে মোঙ্গলদের স্বার্থরক্ষা করা। শইবানি খান আরো বেড়ে ওঠার আগেই তাকে ছেঁটে ফেলা। মাহমুদ খান নিজেও ছোট ভাইকে ২০।২৫ বছর হলো দেখেননি। সুতরাং বাবরকে (বাবর নিজেও এ পর্যন্ত ছোট মামাকে দেখেননি) তার কাছে পাঠানো হোক। সে তাকে তাসকিণ্ট আসার জন্য প্রভাবিত ক'রে নিয়ে আসুক এখানে। দু'ভাই আলাপ-আলোচনা করে মিলিত পদক্ষেপ নিক্।

বাবর মনে করেছিলেন দু'ভাই একত্রে পদক্ষেপ নিলে অচিরে শইবানি খানকে তারা সমরকন্দ থেকে হটাতে পারবেন। তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আরো গভীর। একবার ছোট মামার সাথে দেখা করার জন্য মুঘলিস্তান ও তুরফান যেতে পারলে কে আর পায় তাকে। তিনি তখন হাত-পা ঝাড়া। পুরো লাগাম ছাড়া। মনমতো যেখানে খুশী সেখানে পাড়ি দিতে পারবেন তখন।

শাহ বেগম ও মাহমুদ খান প্রথমে বাবরকে মুঘলিস্তান যেতে অনুমতি দিলেও, পরে মত বদলে ফেললেন। তারা সন্দেহ করলেন, আদর যত্নে ত্রুটি হচ্ছে বলেই হয়তো বাবর এভাবে চলে যাবার ছল খুঁজছে। মাহমুদ খান আরো ভাবলেন, শইবানি খানের দ্রুত সমৃদ্ধি সকলেরই শিরঃপীড়ার কারণ

হয়ে উঠেছে। অতএব আহমদ খানের নিজেরই এ সময়ে যৌথ পদক্ষেপ নেবার লক্ষ্য নিয়ে তাসকিণ্ট আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তার অনুমানই সত্য হলো। যাওয়া আর হলোনা বাবরের।

নিজেদের স্বার্থে ও বাবরের স্বার্থে দুই মামা এবার মিলিত অভিযানের সংকল্প নিলেন। স্থির হলো, প্রথম জয় করা হবে ফরঘান রাজ্য। কেননা, সেটাই তুলনামূলক ভাবে সহজতর হবে। তারপর আরো বলশালী হয়ে মন দেয়া হবে সমরকন্দ জয়ের দিকে। বড়োমামা আরো সিদ্ধান্ত নিলেন, অন্দিজান জয়ের পর তা দেয়া হবে ছোট ভাই আহমদ খানকে। সমরকন্দ জয়ের পর তা দেয়া হবে বাবরকে। তবে যতদিন না সমরকন্দ জয় সম্ভব হয় ততদিন অন্দিজানের অখসী অঞ্চলটি ভোগ করবেন বাবর। এই ভাগ-বাঁটোয়ারার পরিকল্পনা তিনি অবশ্য তখুনি ভাঙলেন না বাবরের কাছে। ভাঙলেন অভিযানে বার হয়ে ফরঘানে প্রবেশ করার পর, অন্দিজান অবরোধের সামান্য কয়েকদিন পূর্বে' তিনি বাবরকে শোনালেন, ছোটমামা অনেকদূর থেকে এসেছেন। শইবানি খানের বিরুদ্ধে সমরকন্দে অভিযান চালাতে হলে তার একটি স্থানীয় ঘাঁটি থাকা প্রয়োজন। এ কারণেই তাকে ফরঘান রাজ্য দেয়া দরকার। (তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ২১শে জুলাই ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল-প্রধান অভিযানার্থে যাত্রা করেন)।

বড়ো মামার সিদ্ধান্তের কথা জেনে খুবই মর্মাহত হলেন বাবর। রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক থেকে বিচার করলে মাহমুদ খানের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। কিন্তু বাবর সে-কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন না। তিনি মামাদের সদিচ্ছায় সন্দিহান হলেন। ফলে তার উৎসাহ উদ্দীপনা কিছুটা ঝিমিয়ে গেল। তার অনুগামী বেগদের উপরও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো। তারা নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বাবরকে মামাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে আহমদ তম্বলের সাথে রফানামায় যেতে প্ররোচিত করলো। কিন্তু তাতে সম্মত হলেন না বাবর। জবাব দিলেন 'খানদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক। তম্বলের হয়ে শাসন করার চেয়ে তাদের অধীনে কাজ করা অনেক শ্রেয়।' অতএব নিজের মনের ক্ষোভ মনে পিষে তিনি মামাদের অনুগত হয়ে রইলেন।

বড়োমামার মনোভাব জানার আগেই ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে সির নদীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র অন্দিজান বাদে আর সবটাই অধিকার ক'রে ফেলেছেন বাবর। হয়তো অন্দিজান দখলও সম্ভব হতো।

নিজের সামরিক ভুলত্রুটির জন্যই তা সম্ভব হয়নি। আর সেই ভুলের মাশুল হিসাবে অনেক বিশ্বস্ত সঙ্গীকে খোয়াতে হয়েছে তার। নিজেও জখম হয়েছেন।

এবার বাবরকে অখসী ও কাসান জয়ের জন্য পাঠিয়ে দুই মামা মাহমুদ খান ও আহমদ খান অন্দিজান অবরোধ করলেন। তারা অখসী থেকে তম্বলের পিছু ধাওয়া ক'রে অন্দিজান এসেছিলেন। অবরুদ্ধ হয়ে দুই খানের প্রবল আক্রমণের চাপে ক্রমশঃ সেনা খুইয়ে তম্বলের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠলো। দীর্ঘকাল তাদের প্রতিরোধ ক'রে চলা অসম্ভব দেখে পরিস্থিতির বদল ঘটানোর জন্য বাবরকে তাদের কাছ থেকে বিছিন্ন ক'রে নিজের দলে টানবার মতলব আঁটলেন। সেজন্য অখসীর শাসনকর্তা ছোট ভাই বায়জীদকে সংকেত দিলেন বাবরের সাথে আলোচনা সুরু করতে ও শহর মধ্যে আমন্ত্রণ ক'রে আনতে।

বাবর বিশ্বাসহন্তা হতে চাইলেন না। খান ভাইদের সব কথা জানালেন। তারা চতুর রাজনীতিজ্ঞের মতো এই সুযোগটিকে তম্বলের মৃত্যুবাণ রূপে ব্যবহার করতে চাইলেন। বাবরকে পরামর্শ দিলেন আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে অখসী প্রবেশ করতে ও সেই সুযোগে বায়জীদকে বন্দী ক'রে হত্যা করতে। বাবর প্রথম পরামর্শ গ্রহণ করলেও দ্বিতীয়টিতে আপত্তি জানালো। কেননা, ওভাবে বায়জীদকে হত্যা করা হবে নৈতিকতা বিরুদ্ধ কাজ, বিশ্বাসঘাতকতা। খানরা তাতেই রাজী হলেন অবশেষে। বায়জীদকে তম্বলের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য নিয়ে বাবর এগিয়ে গেলেন। শান্তি চুক্তি হলো দু'জনের মধ্যে। বাবরের ছোট ভাই নাসির মীর্জা সহ বায়জীদ বাবরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শহর মধ্যে নিয়ে গেলেন।

অখসী দুর্গে বাবরের প্রবেশ ও অন্দিজানের উপর খানদের প্রবল আক্রমণের চাপ তম্বলের অবস্থা আরো কাহিল ক'রে তুললো। তিনি বোধহয় বুঝতে পারলেন তার চালে ভুল হয়ে গেছে। খান ভাইরা অন্দিজান দখলের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাই এবার সংকট কাটাবার জন্য তিনি শইবানি খানের শরণ নিলেন। বড় ভাই তীলূব বেগকে পাঠালেন তার কাছে, ফরঘান রাজ্য তার হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব দিলেন। এমন সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করার মতো মূর্খ নন শইবানি খান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তম্বলকে হটিয়ে ফরঘান অধিকার করতে পারলেই খান ভাইয়েরা সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন সমরকন্দের উপর। সুতরাং খানদের উদ্দেশ্য বানচাল করার জন্য এ প্রস্তাব লুফে নিলেন তিনি। শইবানি খান জানালেন অবিলম্বে সৈন্য নিয়ে তিনি আসছেন। যতদিন না পৌঁছান ততদিন

তম্বল যেন খানভাইদের প্রতিরোধ ক'রে চলেন, কিছুতেই যেন শহর সমর্পণ করা না হয়।

শইবানি খান আসছেন এ খবর খান ভাইদের কানে আসতেই তাদের সব সাহস উবে গেল। সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি অবরোধ তুলে নিলেন। কন্দ-ই-বদাম ও খুজন্দ হয়ে মরঘীনান চলে গেলেন। তম্বলও উৎসাহিত হয়ে তাদের পিছু তাড়া ক'রে মরঘীনান পর্যন্ত ছুটে গেলেন। ফিরলেন তারপর বাবরকে শায়েস্তা করার জন্য।

বাবর পড়লেন এবার গভীর সংকটের সাগরে। অতি বিপদজনক পরিস্থিতির মাঝে দীর্ঘ ঘটনার প্রবাহের ভিতর দিয়ে সমস্ত সঙ্গীদের হারিয়ে মাত্র কুড়িজনকে নিয়ে অখসী ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন। তম্বলের লোকেরাও তার পিছু তাড়া করলো। তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা থেকে পথে একে একে সব সঙ্গীদের হারালেন তিনি। সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়লেন। তারপর রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তিনি যখন তম্বলের কয়েকজন সেনার হাতে বন্দী হতে চলেছেন সেই নাটকীয় মুহূর্তে থেমে গেছে বিবরণ।

বাবর কি বন্দী হয়েছিলেন না ওই সময়ে পালাতে পেরেছিলেন? যদি বন্দী হয়ে থাকেন তবে পরে মুক্ত হলেন কী ভাবে? বাবর কি ইচ্ছে করেই এখানে দীর্ঘ ষোল মাসের বিবরণ অনুক্ত রেখেছেন, নাকি তার বই সাধারণ্যে প্রকাশ পাবার আগে তা কোন কারণে নষ্ট হয়েছে বা কেউ নষ্ট ক'রে ফেলেছে? এমন অসংখ্য প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে, কিন্তু এর সঠিক উত্তর লাভ সম্ভব নয়।

যাই হোক, বাবর যে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচেছিলেন ও মুক্ত ছিলেন বা হয়েছিলেন পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণই তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ।

প্রথমবারের ফরঘান বিজয় অভিযান পর্বতের মূষিক প্রসবে পরিণত হলেও খান ভাইয়েরা চুপ হয়ে থাকলেন না। শইবানি খানের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্য তাদের আবার অভিযানে নামতে বাধ্য করালো। বাবরকে সঙ্গে নিয়ে আবার অন্দিজান আক্রমণ করলেন তারা। এর ফলাফল তাদের পক্ষে বড়োই মর্মান্তিক হলো। শোচনীয় ভাবে যুদ্ধে পরাস্ত হলেন তারা। বাবর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। তার মা শইবানি খানের হাতে বন্দী হলেন। তবে শইবানি খানের পত্নী বাবরের বড় বোন খানজাদা বেগম তাকে গোপনে পালিয়ে ছেলের সঙ্গে মিলিত হতে সাহায্য করলেন।

খান ভাইরা পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালালেও শেষরক্ষা করতে

পারলেন না। শত্রু সৈন্যরা পিছু তাড়া করলো তাদের। বন্দী ক'রে শইবানি খানের কাছে হাজির করলো। শইবানি খান তাদের হত্যা না ক'রে বন্দী ক'রে রাখলেন। পরে, শইবানি খান, তার ছেলে ও ভাইপোর সাথে মোঙ্গল রাজকুমারীদের বিবাহ দিতে রাজী হওয়ায় এই বিবাহের পরে তাদের মুক্ত ক'রে দেয়া হলো। তবে বড়ো খানের রাজ্য তাসকিন্ট শইবানি খানের অধিকারে চলে গেল। দুই খান-ভাই মুঘলিস্তানে চলে গেলেন। এ লাঞ্ছনা ও অপমান হজম করতে না পেরে ছোট ভাই আহমদ খানের স্বাস্থ্যভঙ্গ শুরু হলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেলেন তিনি। তার কিছুদিন পর ক্ষমতার লড়াইয়ে এঁটে উঠতে না পেরে মাহমুদ খান শরণ নিলেন শইবানি খানের। শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করার সুযোগ এবার আর নষ্ট করলেন না শইবানি খান। মাহমুদ খান ও তার পাঁচ পুত্রকে বিদায় নিতে হলো পৃথিবী থেকে।

প্রকৃত বাস্তুহারা হয়ে বাবর পর্বতে কন্দরে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। পরিবেশ ও ভাগ্যকে নিজের হাতের মুঠোয় আনার সংগ্রামে বার বার পরাজিত সৈনিক হয়ে তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে পরিবেশের শিকার।

।। আট ।।

দুশো থেকে তিনশো সঙ্গীকে সাথে নিয়ে বাস্তুহারা হয়ে ঘুরতে থাকলেন বাবর। দক্ষিণ ফরঘানের সুউচ্চ পর্বতমালা ডিঙিয়ে উপস্থিত হলেন হিসার ও কুন্দুজ। এখানে পাশঘরের মোল্লা বাবা ও তার সঙ্গীরা বাবরের সাথে যোগ দিলো। অনুগামীর সংখ্যা বেড়ে যেতে উৎসাহিত হলেন বাবর। আবার রাজ্যের স্বপ্ন কুঁড়ি মেললো তার মনে। হিসার ও কুন্দুজ জয় করা কি খুব অসম্ভব? দূত পাঠালেন অধিপতি খুসরাউ শাহের কাছে। বাহ্য উদ্দেশ্য, তার মন থেকে বাবর সম্পর্কে কোন রকম আশঙ্কা দূর করা। কিন্তু আসল লক্ষ্য, তার রাজ্যের হাল চাল, তার শক্তি সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহ।

তৈমুরের সাম্রাজ্যের একটি ছোট অঞ্চল তৈমুর-বংশীয়দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধীন রাজ্য গড়েছেন খুসরাউ শাহ। সুতরাং তৈমুরবংশীয় বাবরকে আদর অভ্যর্থনা ক'রে খাল কেটে কুমীর আনতে চাইলেন না তিনি তার ক্রিয়াকলাপের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্য উলটে একজন চর পাঠালেন।

সহজে হার মানার লোক নন বাবর। তিনি এগিয়ে তার রাজ্যের গভীরে ঢুকলেন। তীরমীজ থেকে একটু এগিয়ে, আমু নদীর তীরে কবাদীয়ান উপস্থিত হলেন। সেখানে খুসরাউ শাহের এক ছোট ভাই বাকী চঘানীয়ানী দূত পাঠালেন বাবরের কাছে। তিনি তখন শহর-ই-সফা, তীরমীজ প্রভৃতি আমু নদীর উত্তর তীরস্থ জেলাগুলির শাসক। ভাইয়ের সাথে ভালো বনিবনা না চলার দরুন তিনি বাবরের সাথে জোট বাঁধতে উৎসাহ দেখালেন। চুক্তি মতো উভয়ে নিজ নিজ অনুগামীদের নিয়ে তীরমীজে সমবেত হলেন। ঠিক হলো, অজর দুর্গে পরিবারবর্গ ও ভারি তল্পিতল্পা রেখে তারা অভিযানের জন্য অর্থ-সংগ্রহে বার হবেন।

শুরু হলো আবার এক দুরূহ পথযাত্রা। পথে অনেক পারসিক সৈন্য নিয়ে ইয়ার আলী বলাল যোগ দিলেন বাবরের সাথে। কিন্তু কম্বর আলীর এটা পছন্দ হলো না। জিন্দান উপত্যকায় পৌঁছে তিনি দলত্যাগ করলেন। চিরকালের দুঃসাহসী বাবর ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে এগিয়ে চললেন তার বহুজাতিক অনুগামীদের নিয়ে। পৌঁছলেন এসে অজর দুর্গে।

রাজ্যহারা হয়ে ভাই জহাঙ্গীর মীর্জা ও নাসির মীর্জা তখন তার সঙ্গে। সঙ্গে

ছোট জেঠার শেষ ছেলে মীর্জা খানও। দুর্গে পৌঁছে সেখানে কিছু দিন কাটালেন সকলে। এখানে জহাঙ্গীর মীর্জার সাথে বিবাহ দেয়া হলো ছোট জেঠা ও খানজাদা বেগমের মেয়ে অলি বেগমের।

বাবর যখন অজর দুর্গে ভাইকে বিবাহ দিতে ব্যস্ত ইতিমধ্যে শইবানি খান হিসার ও কুন্দুজ দখল ক'রে খুসরাউ শাহকে রাজ্যছাড়া করলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন খুরাসানের অঙ্গরাজ্য খওয়ারিজম দখলের জন্য।

বাবর এসব খবর জানেনও না। হঠাৎ এখানে তিনি খুরাসানের সুলতান হুসেন মীর্জা বঈকারার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। শইবানি খানের বিরুদ্ধে তিনি বাবরের সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়েছেন।

হুসেন মীর্জার বাসনা মতো মুরঘাব নদীকূল রক্ষার জন্য যাত্রা করলেন বাবর। পথে তিনি খুসরাউ শাহের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা জানতে পেলেন। খবর এলো, যেসব মুঘল এতকাল খুসরাউ শাহের অধীনে ছিল তারা এখন বাবরের সাথে যোগ দেবার জন্য উদগ্রীব। বর্তমানে তারা তালিকানে ছাউনি ক'রে আছে। প্রথম সংবাদে রীতিমতো চমকে গেলেন বাবর। দ্বিতীয় সংবাদ তাকে উৎসাহিত ক'রে তুললো। এগিয়ে গেলেন কীজীল-সু-র দিকে। প্রায় তিন থেকে চার হাজার মুঘল সৈন্যকে স্বাগত জানিয়ে দলে নিলেন তিনি।

এদিকে খুসরাউ শাহ কুন্দুজ থেকে পালিয়ে কাবুলের দিকে যাত্রা করেছিলেন। পাহাড়ী এলাকার সরু উপত্যকাগুলি পার হতেই তিনি এসে পড়লেন বাবরের ছাউনির কাছাকাছি। তার সাথে তখন প্রচুর অনুগামী। কিন্তু মনোবল ভেঙে গেছে তার। উজবেগদের হটিয়ে আবার রাজ্য দখলের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। এ সময়ে বাবরের দেখা পেয়ে তিনি ভাবলেন ভবিষ্যত বিপর্যয় এড়াতে হলে তার সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং জামাতা আয়ুবকে তিনি বাবরের কাছে পাঠালেন সেজন্য। ঠকবাজ, অবিশ্বাসী ও উচ্চাশী খুসরাউ শাহকে দলে নিতে দ্বিধা করলেন বাবর। কিন্তু শেষ অবধি বাকী চঘানীয়ানীর উদ্যমে উভয়ের মধ্যে রাজীনামা সম্ভব হলো। ঠিক হলো খুসরাউ শাহের জীবন ও বিষয়-সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না, নেয়া হবে তাকে বাবরের অধীনে চাকুরিতে।

বাবর আরো এগিয়ে গিয়ে অনদরাব নদী পার হয়ে দুশী জেলায় ছাউনি ফেললেন। খুসরাউ শাহ কাছেই ছাউনি ক'রে ছিলেন। তিনি দেখা করলেন বাবরের সাথে। তার অনুগামীরা সকলে বাবরের দলে যোগ দিল।

সেদিন বিকেলেই সুলতান মাহমুদ মীর্জার একমাত্র জীবিত বংশধর, ছোট

ছেলে খান মীর্জা এসে উপস্থিত হলেন। দাবী তুললেন খুসরাউ শাহকে হত্যা ক'রে তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হোক। কী করেন বাবর? এদিকে যে তিনি খুসরাউ শাহকে প্রাণ ও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উভয় সঙ্কটে পড়ে তিনি তাকে সঙ্গে থাকা রূপা, সোনা, অলঙ্কারাদি নিয়ে খুরাসান চলে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বাবরের আদেশ মতো শেরিম তঘাই তাকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

কিছুদিন পর উপদেষ্টা বাকী চঘানীয়ানী জহাঙ্গীর মীর্জাকেও খুরাসানে পাঠিয়ে দেবার জন্য বাবরকে উপদেশ দিলেন। বাকী তাকে সদুপদেশ দিলেও বাবর তাতে কান দিলেন না। এটা যে বাবরের পক্ষে বিরাট ভুল হয়েছিল সন্দেহ নেই। কেননা জহাঙ্গীর মীর্জাকে ঘিরে বিশ্বাসঘাতকের দল আগেও যেমন তৎপর ছিল, পরবর্তীকালেও তাই। আর, এর ফলে বাবরকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়েছে বার বার।

খুরাসান বাদ দিলে অধিকারে এখন শইবানি খানের সমগ্র অঞ্চল। এখানে ভাগ্যোদ্ধারের চেষ্টা পুরো অর্থহীন। তার সাথে লড়াই ক'রে ফরঘান বা সমরকন্দ উদ্ধার করতে হলে সবার আগে দরকার নিরাপদ মজবুত ঘাঁটি। বর্তমানে সেজন্য সব থেকে আদর্শ অঞ্চল হলো কাবুল। খুসরাউ শাহের রাজ্য শইবানি খানের দখলে যাবার পর বাকী চঘানীয়ানী এ কারণে কাবুলের উপর নজর দেবার পরামর্শ দিলেন বাবরকে। তার এ পরামর্শ যথার্থ বলে মনে হলো বাবরের। কাবুল অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। অনুগামীদের নিয়ে সেদিকেই যাত্রা করলেন দুশী থেকে।

বাবরের পিতামহ আবু সৈয়দ মীর্জার মৃত্যুর পর কাবুল পড়েছিল তার মেজো জেঠা উলুঘ বেগ মীর্জার ভাগে। সবে দু'বছর হলো মেজো জেঠা মারা গেছেন (১৫০১ খ্রীষ্টাব্দ), এক নাবালক ছেলে রেখে। নাম তার অবদুর রজ্জক মীর্জা। এ রকম পরিবেশে সচরাচর যা হয় তাই দেখা দিল কাবুলে। ক্ষমতা নিয়ে আমীরদের মধ্যে কুৎসিত লড়াই শুরু হয়ে গেল। এ লড়াইয়ে ক্ষমতা দখল করলেন জিকর বেগ। স্বেচ্ছাচারীর মতো রাজ্য চালাতে থাকলেন তিনি। বেশিদিন সে রাজত্ব চললো না। কাবুলে ডামাডোল দেখে প্রতিবেশী রাজ্যের নজর পড়লো তার উপর। গরমশীরের অধিপতি জুলনুন বেগ অরঘুনের ছোট ছেলে মুহম্মদ মুকীম এই সুযোগে তাকে দখল ক'রে নিলেন। বিয়ে করলেন উলুঘ বেগ মীর্জার মেয়েকে। সেই থেকে কাবুল

তার রাজ্য। সকলের লোভ-দৃষ্টি এড়িয়ে দু'বছর হলো তিনি সেখানে শান্তিতে রাজ্য ক'রে চলেছেন। অবদুর রজ্জক মীর্জা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন প্রতিবেশী পার্বত্য আফগানদের মধ্যে।

ফেঁপেফুলে ওঠা নিজের বাহিনী নিয়ে বাবর কাবুল দখলের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চললেন। হিন্দুকুশের দুর্গম তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্যউপত্যকা পার হবার জন্য বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হলো তাকে। উপস্থিত হলেন ঘুর-বন্দ নদীকূলে উশতুর শহর। খবর পেলেন, মুকীম বেগ অরঘুনের সেনাপতি শেরক অরঘুন বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে বারান নদীতীরে ছাউনি গেড়ে আছেন। নজর রেখে চলেছেন যাতে কোন শত্রুপক্ষ বা সাহায্যকারী সেনাবাহিনী পনঝিরের পথ ধরে লমঘান যেতে না পারে, অবদুর রজ্জক মীর্জার সাথে যোগ দেবার জন্য। শেরক অরঘুন তার উপস্থিতির খবর পাননি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাবর তার বাহিনীর উপর অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। উদ্দেশ্য সফল হলো। পরাস্ত হলেন শেরক অরঘুন। বাবরের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিয়ে তারই দলে যোগ দিলেন তিনি।

এবার খোদ কাবুলের দিকে পা বাড়ালেন বাবর। পথে কুন্দুজ থেকে ভাগ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়া অনেক গোষ্ঠী ও উপজাতির লোক তার সাথে যোগ দিল। এই যাযাবর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভিন্ন মুঘল গোষ্ঠীও রয়েছে। আছে হজারা-রাও।

নদীজলের মতো ক্রমশঃ বেড়ে চলা বাহিনী নিয়ে বাবর পৌঁছলেন এসে করা-বাগের তৃণাঞ্চলে, অকসরইয়ে। এটি কাবুল থেকে ১২ হতে ১৫ মাইল পশ্চিমে। বংশপরম্পরায় লুটপাটে অভ্যস্ত মুঘলরা প্রতিবারের মতো এবারও তার গভীর বিরক্তির কারণ হয়ে উঠলো। এ ধরনের অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ জারী করা হলো সকলের উপর। কিন্তু ফল হলো না। সে নির্দেশ অমান্য ক'রে লুটপাট চালিয়ে যেতে থাকলো তারা। নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বাবর এবার দৃষ্টান্ত স্থাপনার সিদ্ধান্ত নিলেন। হজারা সর্দার সঙ্গদীম আলীর এক অনুগামীকে একপাত্র তেল ছিনতাইয়ের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিলেন তিনি। এ পদক্ষেপ সবাইকে সচকিত ক'রে তুললো। বাবরের উদ্দেশ্য সফল হলো এবার। যথেচ্ছ লুটপাট বন্ধ হয়ে গেল।

সেনাবাহিনীতে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরবর্তী কর্তব্য নিয়ে বাবর আমীরদের সাথে পরামর্শ সুরু করলেন। শীত ঘনিয়ে আসার জন্য সৈয়দ

য়ুসুফ প্রমুখ তাকে উপদেশ দিল বর্তমানে লমঘান চলে যেতে। শীত কাটার পর কাবুল দখল চেষ্টা করার জন্য। বাকী চঘানীয়ানী পরামর্শ দিলে : না, এখুনি কাবুল আক্রমণ করা হোক। এ সময়ে অতর্কিত আক্রমণ করলে মুকীম অরঘুনকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যাবে, দুর্গ দখল সহজ হবে। তাছাড়া উপজাতি সর্দাররাও নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ঘোট পাকাবার সময় পাবে না। চঘানীয়ানীর পরামর্শ খুব যুক্তিযুক্ত মনে হলো বাবরের। বুদ্ধিমানের মতো আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। এগিয়ে এলেন কাবুলের নিকটবর্তী অব-কুরুকে।

বাবরের মা ও অন্যান্য পরিবার বর্গও অজর থেকে এসে এই অব-কুরুকে বাবরের সাথে যোগ দিল। একাধিক কার্যকারণে অজরে নিরাপদে বাস করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাই শেরিম তঘাইয়ের সাথে চলে এসেছেন তারা। পথে সমরকন্দী উপজাতিদের দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছেন। অতিকষ্টে কীবচাক গিরিপথ পার হয়ে কোনমতে প্রাণ হাতে নিয়ে অব-কুরুক পৌঁছেছেন।

আরো এগিয়ে চালাক তৃণভূমিতে ছাউনি ফেললেন বাবর। আলোচনা ক'রে দুর্গ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঘেরাও করা হলো কাবুল শহর ও দুর্গ। এজন্য সমস্ত বাহিনীকে তিনটি দলে ভাগ করলেন তিনি। একদলের নেতৃত্ব নিলেন তিনি। অপর দু' দলের নেতৃত্বে রইলেন বাবরের দু' ভাই জহাঙ্গীর মীর্জা ও নাসির মীর্জা।

শহর ও দুর্গ সমর্পণের জন্য মুকীম বেগ অরঘুনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলো। তিনি সাথে সাথে কোন উত্তর দিলেন না। সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন বাবর। কালহরণ করার জন্যই এ পথ নিয়েছিলেন মুকীম বেগ। বাবরের হাতে শেরক অরঘুন পরাস্ত হবার সংবাদ পাবার পর থেকেই তিনি শত্রু-প্রতিরোধের আয়োজনে মন দিয়েছিলেন। এজন্য পিতা ও বড়ো ভাইয়ের কাছেও সাহায্য চেয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন। তারা যে কোন সময়ে তাকে সাহায্যের জন্য এসে পড়তে পারে এই আশায় তিনি এভাবে কালহরণ ক'রে চললেন। কিন্তু বেশিদিন তা ক'রে চলা সম্ভব হলো না। বাবরের সামরিক তৎপরতা তার পরিস্থিতি ক্রমশঃ সংকটময় ক'রে তুললো। ধনসম্পত্তি ও প্রাণ নিয়ে নিরাপদে দেশত্যাগের সুযোগ লাভের সর্তে শহর ও দুর্গ সমর্পণ করলেন তিনি। বাবরের কাবুল অভিযান সার্থক হলো। সুরু হলো তার ভাগ্যের সূচনা (অকটোবর, ১৫০৪)।

মুকীম বেগের সম্পদ ও তল্পীতল্পা সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি মতো পূর্ণ

ব্যবস্থা নিলেন বাবর। যাতে স্থানীয় অধিবাসীদের বিষয় সম্পত্তি লুটপাট করা না হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি দিলেন। দুই ছোট ভাই জহাঙ্গীর ও নাসির মীর্জা এবং কতক বিশ্বস্ত আমীরের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন তিনি। কিন্তু স্বভাব-উচ্ছৃঙ্খল বিভিন্ন মুঘল উপজাতিদের বাগ মানাতে পারলেন না তারা। দ্বারস্থ হলেন বাবরের। বাবর খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। তীর চালিয়ে দু-তিন জন দুষ্কৃতকারীকে আহত ক'রে ধরে আনা হলো, দেয়া হলো মৃত্যুদণ্ড। সাথে সাথে লুটপাটের লোভ সংযত হয়ে গেল মুঘলদের। মুকীম ও তার পরিবারবর্গকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হলো টীপা। কয়েকদিন সেখানে থাকার পর তারা তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে কন্দহার চলে গেলেন।

নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত উত্থান-পতন দুঃখ-কষ্ট-বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ দশ বছরের উপর এবং বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় বার সমরকন্দ জয়ের পরবর্তী দিনগুলিতে কর্মপ্রাণ দুঃসাহসী বাবর জীবনের কাছে যে বাস্তব পাঠ গ্রহণ করেছেন, তারই অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে এবার তিনি রাজ্য সংগঠনে নামলেন। তিনি এখনও সমান দুঃসাহসী হলেও আগের তুলনায় অনেক বাস্তবমুখী; সংহত, সংযত, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান। তাই তার সাংগঠনিক ক্ষমতাও আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কী ক'রে সে সংগঠনকে দৃঢ় ও স্থিতিশীল করা যায় সে কৌশলটিও আয়ত্তে এনেছেন তিনি। তাই সাথে সাথেই রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন না তিনি। শইবানি খানের কাছ থেকে ফরঘান বা সমরকন্দ দখলের জন্যও উদ্বেল হয়ে উঠলেন না। মন ঢেলে দিলেন পুরোপুরি নতুন জয় করা রাজ্যে নিজেকে সুস্থিত ক'রে তোলার দিকে। রাজ্যের অধিবাসীদের সুশাসন উপহার দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করতে চাইলেন তিনি। সামরিক সংগঠনকে আরো সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ক'রে নিজের ক্ষমতাকেও বলবান ও বেগবান করতে চাইলেন।

কাবুল রাজ্যের আয়তন বিরাট না হলেও, ছোটও নয়। এর চতুঃসীমার উত্তর দিকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা, দক্ষিণ দিকে চাঘান সরাই, পূবদিকে আব-উস্তাদহ, ও পশ্চিমদিকে খুরাসান পর্বতমালা। বাবর তার জীবনী মধ্যে নিপুণভাবে এ অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক বর্ণনা দিয়েছেন। এ রাজ্যের অবস্থান এমন একটি স্থানে যেখান থেকে তিনি যেমন অতি সহজেই শইবানি খানের সাম্রাজ্যের দিকে, সমরকন্দের দিকে নজর দিতে পারেন; পারেন আবার অনায়াসে হিন্দুস্থান বা ভারতের বিশাল ভূ-খণ্ডের দিকেও নজর দিতে। কাবুলের

এই গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বুদ্ধিমান বাবরের বেশি দেরি হলো না। তাই, আরো বেশি উৎসাহের সঙ্গেই তিনি এখানে স্থায়ী হতে চাইলেন।

অভিযানে যারা তার সাথী হয়েছিলেন তাদের সবাইকেই তিনি প্রাপ্য ভাগ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন। এজন্য সমগ্র রাজ্য তাদের মধ্যে বেঁটে দেয়া হলো। নিজের হাতে বাবর রাখলেন শুধু রাজধানী ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। জহাঙ্গীর মীর্জাকে দিলেন গজনী ও তার অধীন অঞ্চল। নাসির মীর্জাকে দিলেন নিংগ্‌নহার, মন্দ্রাবর, নিন উপত্যকা, কুনার-নূর-গল ও চাঘান সরাই। অঞ্চল ভাগের বেলা ন্যায়-নিষ্ঠ হতে চেয়েও তিনি সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। এর একটি কারণ এই যে নতুন রাজ্যের সব অঞ্চলের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না, জানতেন না কোন্ অঞ্চল কতটা উর্বর বা অনুর্বর। অভিযোগ উঠল তিনি তার পুরানো অনুগামী ও অন্দিজানীদের প্রতি বেশি আনুকূল্য দেখিয়েছেন। বাবর নিজে একথা অস্বীকার করলেও এ অভিযোগ উড়িয়ে দেয়া যায় না। মনে হয় এই আনুকূল্যকেই তিনি ন্যায়-বিচার বলে ধরে নিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তার পুরানো অনুগামী ও স্বদেশবাসীদের তার বিশেষ অনুগত রাখতে চেয়েছিলেন।

সমরকন্দ, হিসার, কুন্দুজ ও অন্যান্য স্থান থেকে যেসব গোষ্ঠী ও উপজাতিরা তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন তাদেরও সন্তুষ্ট করতে হিমসিম খেয়ে গেলেন তিনি। এ অভিযানে বাবরকে তারা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কিন্তু সবাইকে সন্তুষ্ট করার মতো যথেষ্ট ভূমি বা সম্পদ কোথায়? একদিকে সম্পদের অভাব, অন্যদিকে উপজাতিদের লুণ্ঠন জীবিকা ও সাধারণ অধিবাসীদের ভূমি ও কৃষি নির্ভর জীবনের মধ্যে সংঘাত বাবরকে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে ফেলে দিল। তিনি দেখলেন এদের সবাইকে পছন্দ মতো বাসস্থান দেয়া অসম্ভব। অতএব অসন্তোষ ধামাচাপা দেবার জন্য উৎকোচ প্রদানের নীতি ধরলেন তিনি। কিন্তু সেজন্যই বা সম্পদ আসবে কোত্থেকে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও, জনসাধারণের উপর অধিক কর বসাতে বাধ্য হলেন তিনি। ফলে সমস্যা সমাধানের বদলে আরো জটিল হয়ে উঠলো। একমাত্র কাবুল, গজনী ও তার অধীন এলাকাগুলিতেই তিরিশ হাজার গাধা বোঝাই শস্য-কর দেবার দায় চাপানো হলো। এই অস্বাভাবিক করের চাপে সাধারণ মানুষের দুর্দশার একশেষ। দেখা দিল অসন্তোষ। হজারা-রা তো বিদ্রোহই ক'রে বসলো। কর আদায়কারীদের অস্ত্র নিয়ে তাড়া করলেন তারা, কর দিলেন না। ছুটলেন

বাবর সে বিদ্রোহ দমন করতে। কিন্তু এ অভিযান পুরোপুরি সফল হলো না। ফিরে এলেন তিনি।

কাবুল ফিরে তিনি দরঘা খানের ছেলে য়ার হুসেনের আগমন সংবাদ পেলেন। সিন্ধুর ওপারে ঝিলম নদীর দক্ষিণে অবস্থিত ভীর থেকে এসেছেন তিনি। দেখা করলেন বাবরের সাথে। প্রস্তাব দিলেন হিন্দুস্তান অভিযান করার জন্য। এ প্রস্তাবে আগ্রহ দেখালেন বাবর। এই মুহূর্তে রাজ্য বিস্তারের কোন পরিকল্পনা তার অবশ্যই ছিল না। কিন্তু সৈন্যদের ব্যস্ত রাখার জন্য, রাজ্যের অর্থ-সমস্যা দূর করার জন্য এরকম কোন অভিযানের কথাই তখন চিন্তা করছিলেন তিনি।

আগ্রহ দেখালেও সঙ্গে সঙ্গে অভিযানে বার হলেন না বাবর। বিভিন্ন সূত্রে হিন্দুস্তানের বিশদ ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ সংগ্রহ করলেন। তারপর ১৫০৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী নাগাদ যাত্রা করলেন। এই বাবরের প্রথম হিন্দুস্তান অভিযান। বদাম চশমা ও জগদালিক হয়ে দু'দিন পরে অদীনপুর (জালালাবাদ) পৌঁছলেন।

কাবুলের অধিত্যকা থেকে হিন্দুস্থানের সমতল ভূমিতে পা দিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন বাবর। "তার আগ পর্যন্ত আমি কখনো গ্রীষ্মের দেশ বা হিন্দুস্তানের সীমান্ত এলাকা দেখিনি। নিঙ্গ্নহার পৌঁছে অন্য এক জগৎ চোখে পড়লো। অন্য রকমের সব ঘাস, অন্য রকমের সব গাছপালা, অন্য ধরনের সব পশু-পাখি। গোষ্ঠী ও উপজাতিদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার পর্যন্ত অন্য রকমের। আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম, সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হবার মতো!"

জূই-শাহী, কুশ-গুম্বজ পার হয়ে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম ক'রে বাবর জামরুদ এলেন। এখানে পৌঁছে সিন্ধুনদ পার হবেন কিনা তা নিয়ে আলোচনায় বসলেন আমীরদের সাথে। মূল পরিকল্পনা ছিল সিন্ধুনদ পার হবার। বাকী চঘানীয়ানী সে পরিকল্পনা বাতিল ক'রে কোহাট অভিযানের পরামর্শ দিলেন। মন্ত্রীর এ উপদেশ গ্রহণ করলেন বাবর। পথে গাগিয়ানী আফগান সর্দার তার সাথে দেখা করলেন, স্বীকার ক'রে নিলেন তার আনুগত্য। এই গাগিয়ানী আফগানদের সহায়তায় তিনি কোহাট পৌঁছলেন, আক্রমণ করলেন আফগানদের। তাদের ঘেরাও ও বন্দী ক'রে গরু, মোষ, খাদ্যশস্য ছিনিয়ে নেয়া হলো। পাঠানো হলো বিভিন্ন দলকে সিন্ধুতীর পর্যন্ত এগিয়ে

গিয়ে নানা স্থান থেকে ঘোড়াদের খাদ্য লুটপাট ক'রে আনার জন্য। কোহাটে দু'রাত থাকাকালে তিনি আমীরদের সাথে আবার আলোচনায় বসলেন.পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে। ঠিক হলো বঙ্গশ ও বন্নুতে এ রকম আক্রমণ ও লুটপাট চালিয়ে কাবুল ফিরে যাবেন তারা।

বঙ্গশ যাত্রা করলেন বাবর। কোহাট থেকে হনগু পর্যন্ত যাবার পথটি একটি উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এই উপত্যকা দু'দিক থেকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। বাবর সে এলাকায় প্রবেশ করা মাত্র কোহাট ও সন্নিহিত এলাকার আফগানরা জোটবদ্ধ হয়ে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সুরু ক'রে দিল। বাবর তার সৈন্যবাহিনীকে বহু দলে ভাগ করলেন। চারদিক থেকে পুরো এলাকাটিকে ঘিরে একযোগে আফগানদের আক্রমণ করার জন্য তাদের বিভিন্ন দিকে পাঠানো হলো। পরিকল্পনা সফল হলো। আফগানেরা দীর্ঘ প্রতিরোধে সক্ষম হলনা। দুশোজনেরও বেশি আফগানকে বন্দী করা হলো। তাদের মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দিলেন বাবর। তারপর মোঙ্গল প্রথার অনুসরণ ক'রে সেই মুণ্ড সাজিয়ে এক স্তম্ভ তৈরী করা হলো শিবির মধ্যে।

একে একে কুরানী, কিউই, সুর, ঈশা-খইল ও নিয়াজাই আফগানদের আক্রমণ ও লুটপাট করলেন। তারপর বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসছে দেখে তিনি কাবুল ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মাত্র কিছুপথ এগিয়েছেন এমন সময় জহাঙ্গীর মীর্জা খবর দিলেন বাকী চঘানীয়ানী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য গোপন ষড়যন্ত্র চালিয়েছেন। নিজের রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণের জন্য তিনি কাবুলের সিংহাসন থেকে বাবরকে হটিয়ে তাকে, অর্থাৎ জহাঙ্গীর মীর্জাকে, সেখানে বসাবার প্রস্তাব দিয়েছেন। তার মূল পরিকল্পনা হলো—বিশ্বস্ত জনা দশেক সঙ্গীসহ বাবরকে বন্দী-করে সিন্ধু নদের ওপারে, হিন্দুস্থানে নির্বাসিত করা।

আমরা আগেও দেখেছি, বাবরের আমীররা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ পথে বার বার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, সেকালের চলন মতো, বাবরকে তারা সর্বদাই হাতের পুতুল বানিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। এভাবে যে আদর্শ রাজা হওয়া যায় না, প্রজাদের সুশাসন উপহার দেয়া চলে না, সম্ভব নয় সাম্রাজ্য গড়া, বাবর তা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এবং তা এড়াবার জন্য সব সময়েই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু অপরিণত বুদ্ধির জন্য সে প্রভাব অতিক্রম করতে গিয়ে কখনো তিনি পারেননি, কখনো বা নিজের

বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। কিন্তু বর্তমানে বাবর পরিণত। কী ক'রে অন্যের হাতের পুতুল না হয়ে অন্যকে নিজের হাতের পুতুল ক'রে রেখে নিজের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সফল করতে হয় তার কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছেন। এবার প্রথম থেকেই সে বিষয়ে তিনি সজাগ। সুতরাং বাকী চঘানীয়ানীর চক্রান্তের খবর শুনে তিনি ঘাবড়ালেন না। একটি সেনাদল নিয়ে আগে আগে পথ চলে জহাঙ্গীর মীর্জার উপর আফগানদের হটিয়ে পথ পরিষ্কার রাখার ভার দিয়ে তিনি গজনীর দিকে এগিয়ে চললেন।

বাকী চঘানীয়ানীর সাথে যোগাযোগের পর থেকেই বাবরের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। এজন্য চঘানীয়ানীর অবদান তুচ্ছ নয়। তার সুপরামর্শই বাবরকে কাবুলমুখী করেছে, করেছে কাবুল জয়ে সাহায্য। সুতরাং কাবুল জয়ের পর উচ্চাকাঙ্খী চঘানীয়ানী যে আরো উচ্চাকাঙ্খী হয়ে উঠবেন, বাবরকে নিজের হাতের মুঠোয় রেখে, আপন ইচ্ছামতো রাজ্যশাসনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠবেন এ তো স্বাভাবিক। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বাবর তা অনুমান করতে পেরেছিলেন বলে প্রথম থেকেই সেদিকে সজাগ ছিলেন। চঘানীয়ানীর প্রতিভা ও কৃতিত্বের জন্য বাবর তাকে উদারভাবে পুরস্কৃত করলে এবং উজীর পদ দিলেও, তার সব কথা শুনতেন না। এমনকি উজীর হিসাবে যে সব কাজ চঘানীয়ানীর স্বাধীন ভাবে করার এক্তিয়ার আছে তাতেও তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। ফলে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সংঘর্ষ। বাবর যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে তৈরি, তাকে যে আপন মুঠোয় আনতে পারবেন না তা বুঝতে পেরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী চঘানীয়ানী বাবরকে হটিয়ে জহাঙ্গীর মীর্জাকে সিংহাসনে বসাবার চক্রান্তে মাতলেন। কিন্তু জহাঙ্গীর মীর্জা সম্ভবতঃ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে, এর পরিণতি ভাল হবে না বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ালেন, সব কথা ফাঁস ক'রে দিলেন বাবরের কাছে। ফলে চঘানীয়ানীর চক্রান্ত শেষপর্যন্ত আর সফল হতে পারলো না। এমনকি পরে বাবরের কাছে পুরো নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তিনি। বাবরের জীবনে এ নিশ্চয়ই এক বিরাট সাফল্য। ফলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ পথে আর কোন অন্তরায় রইলো না। মুক্ত হলো সাম্রাজ্য গড়ার পথ।

বাবরের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আরো দুটি বিশেষ পরিবর্তন এ সময়ে দেখা যায়। পূর্বে আমরা দেখেছি তিনি সর্বদা প্রজারঞ্জক রাজা হতে চেয়েছেন। আর এ জন্য সর্বদা তিনি লুটপাট ও আতঙ্ক সৃষ্টির বিরোধিতা করে এসেছেন। প্রথমবার যখন তিনি সমরকন্দ অধিকার করেন তখন তিনি

যদি প্রজাদের দিকে না তাকিয়ে লুটপাটের হুকুম দিতেন তবে বোধ হয় তাকে সমরকন্দ ও ফরঘান হারাতে হতো না; তার জীবনের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেত। এবার কাবুল জয়ের বেলাও তিনি লুটপাট হতে দেননি। তাকে কঠোর ভাবে দমন করেছেন। কিন্তু তার ফলে তিনি প্রথমবার সমরকন্দের মতো এখানেও আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হলেন। এই সমস্যা দূর করার জন্য প্রথমে তিনি প্রজাদের উপর গুরুভার কর চাপালেও পরে অন্য রাজ্য লুটপাট ক'রে সে সমস্যার সমাধান করলেন। আদর্শের সাথে বাস্তবের এ এক অভিনব সমন্বয় বিধান। এটি প্রশংসনীয় না হলেও আপন স্বার্থের দিক থেকে অবশ্যই চতুর বাস্তবমুখী সমাধান।

দ্বিতীয়ত, কাবুল পর্যন্ত, পূর্বপুরুষ তৈমুরের সাম্রাজ্য মধ্যে কোথাও তিনি নৃশংস আচরণের দ্বারা জন-সাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাননি। সংস্কৃতিবান, রুচিবান, হৃদয়বান, শৃঙ্খলাপরায়ণ প্রজারঞ্জক রূপেই নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু পূর্ব-পুরুষের রাজ্য সীমানার বাইরে, আফগান অঞ্চল ও পরে হিন্দুস্তানের গভীরে প্রবেশ কালে তিনি কিন্তু আতঙ্ক সৃষ্টিতে পিছ-পা হননি। স্থূলরুচিবান ও নৃশংস বলে তিনি বরাবর মোঙ্গল তথা মুঘলদের ঘৃণা ক'রে এসেছেন, হেয় চোখে দেখেছেন। কিন্তু হিন্দুস্তানে পা দিয়ে সেই মোঙ্গলদেরই নৃশংস, বর্বরোপম প্রথার অনুসরণ ক'রে নরমুণ্ডের স্তম্ভ বা পিরামিড গড়তে তার বাধেনি। কেন? কারণটি অবশ্য সুস্পষ্ট। তৈমুর সাম্রাজ্য মধ্যে তৈমুরবংশীয়দের দীর্ঘকাল রাজত্ব ফলে স্বভাবতঃই তাদের প্রতি প্রজাদের আনুগত্যের অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি মানেই জনপ্রিয়তা হারানো। সেখানে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রজারঞ্জক রূপে সুখ্যাতি অর্জন। কিন্তু তৈমুরের সাম্রাজ্যসীমা পার হবার পর ভিন্ননীতি অনুসরণের প্রয়োজন বোধ করলেন বাবর। তাদের স্বাভাবিক আনুগত্য তৈমুর বংশীয়দের প্রতি নয়। তাদের কাছে তিনি সম্পূর্ণ আগন্তুক, অবাঞ্ছিত আক্রমণকারী। তাই তাদের আনুগত্য অর্জনের জন্য তিনি দ্বিমুখী নীতি বেছে নিলেন। প্রথমে ত্রাসের সৃষ্টি ক'রে তাদের মন থেকে প্রতিরোধের সাহস ও মনোবল মুছে দেয়া, এবং পরে সুশাসন উপহার দিয়ে বিরূপতা দূর ক'রে তাদের মনে অনুরক্তির সঞ্চার করা। অর্থাৎ এখানেও তিনি তার আদর্শ ও রুচির সাথে বাস্তবের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন জীবনের পাঠশালায় শিক্ষার অভিজ্ঞতা দিয়ে।

প্রায় চার মাস পরে, যে ১৫০৫ অব্দে এ অভিযান সমাপ্ত ক'রে বাবর কাবুল ফিরে এলেন। এ অভিযানে তিনি যেরূপ সম্পদ আহরণ করতে চেয়েছিলেন তা অবশ্য সম্ভব হয়নি। তবু কাবুল ও কোহাট এ দুয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য আফগানদের রীতি-নীতি চরিত্রের সাথে এ সুযোগে তিনি পরিচিত হলেন। এ অঞ্চলের ভূ-পরিচয়ও ঘটলো তার।

ফিরে এসে কিছুকালের মধ্যেই কন্দহার অভিযানের পরিকল্পনা আঁটলেন তিনি। কিন্তু এমন সময় তার মা কুতলুক নিগর খনীমের মৃত্যু হলো। নিজেও কয়েকদিনের জন্য অসুখে পড়লেন। তারপরেই ঘটলো বিধ্বংসী ভূমিকম্প। কাবুলবাসীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এর ফলে। ২০ দিন থেকে এক মাসের মতো সময় ব্যয় হলো দুর্গাদি মেরামত ও জনসাধারণের ত্রাণকার্যে। এই ত্রাণকার্য তাকে কাবুলে জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করলো। এসব আকস্মিক ঘটনার ফলে অভিযান স্বভাবতঃই স্থগিত রাখতে হয়েছিল। এবার সেনাবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাবর।

জহাঙ্গীর মীর্জা ও বাকী চঘানীয়ানী তাকে কন্দহারের পরিবর্তে কলাত-ই-খিলজই (কলাত) আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। তাতে সায় দিয়ে কলাত অভিমুখেই এগিয়ে চললেন বাবর। তজী যাবার পথে শের আলী, কিচিক দিওয়ানা ও আরো কয়েকজন আমীর তাকে ছেড়ে চলে যাবার ফিকির করলো। বাবর বন্দী করলেন তাদের। শের আলীকে প্রাণদণ্ড দেয়া হলো। অন্যরা ছাড়া পেয়ে গেলেন।

কলাত পৌঁছে দুর্গ আক্রমণ করলেন বাবর। তাদের প্রতিহত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হতে মুকীম বেগ অরঘুনের প্রতিনিধি ফরুখ অরঘুন ও কর বিলুত দুর্গ সমর্পণ ক'রে বাবরের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিলেন। তিনি জহাঙ্গীর মীর্জার উপর এখানকার শাসনভার দিতে চাইলেন। কিন্তু কলাত দুর্গটি বাবরের রাজ্যের এক সুদূর কোণে অবস্থিত বলে তিনি এর ভার নিতে সাহসী হলেন না। তখন বাকী চঘানীয়ানীকে এর ভার দিতে চাইলেন বাবর। একই কারণে তিনিও পিছিয়ে গেলেন। ভাই ও উজীর দু'জনেরই উপর এতে অসন্তুষ্ট হলেন বাবর। বিশেষ করে উজীর চঘানীয়ানীর উপর। জয় করেও দুর্গকে আর ধরে রাখার চেষ্টা করলেন না তিনি। ফিরে এলেন কাবুল। আসার পথে কলাতের দক্ষিণ দিককার সওয়াসুঙ্গ ও আল-তষ্ব আফগানদের আক্রমণ করলেন।

বাকী চঘানীয়ানীর ষড়যন্ত্রের খবর জেনেও এতকাল সরাসরি তার উপর কোন হস্তক্ষেপ করেননি বাবর। এর একটি কারণ, সব কিছু সত্ত্বেও চঘানীয়ানীর প্রতিভা ও যোগ্যতা। এছাড়া ভাগ্যোদয়ের জন্যও তিনি তার কাছে বিশেষ ঋণী। কিন্তু এবার তার আচরণ বাবরকে তার প্রতি বিরূপ ক'রে তুললো। তাকে শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। নিজের প্রতিভা ও বাবরের কাছে তার গুরুত্ব সম্পর্কে চঘানীয়ানী একটু বেশি রকমের সচেতন ছিলেন। সেই অহমিকাবশতঃই তিনি নিজেকে বাবরের পক্ষে অতি অপরিহার্য মনে করতেন। বাবর তাকে কখনো হাতছাড়া করতে চাইবেন না এই স্থির বিশ্বাস থেকে তিনি বাবরের সাথে কোন রকম মতবিরোধ দেখা দিলেই পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। আগে কোনবারই বাবর সে ইচ্ছায় সম্মতি দেননি। এবারও একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চঘানীয়ানী বাবরের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, প্রতিবারের মতো এবারেও বাবর তা গ্রহণ করবেন না। কিন্তু তাকে হতবাক ক'রে দিয়ে বাবর সে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। এ অপ্রত্যাশিত আঘাতে দমে গেলেন চঘানীয়ানী। তখন বাবরকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি তার নটি অপরাধ ক্ষমা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাবর সাথে সাথে একটি তালিকা পাঠিয়ে দেখিয়ে দিলেন, তিনি এ পর্যন্ত তার এগারোটি অপরাধ নীরবে সহ্য করেছেন। হার মানলেন চঘানীয়ানী। নতি স্বীকার ক'রে সিন্ধু নদ পার হয়ে হিন্দুস্তান চলে যাবার অনুমতি চাইলেন তখন। বাবর অনুমতি দিলেন। কিন্তু হিন্দুস্তান যাবার পথে য়ার-ই-হুসেনের দস্যুবাহিনীর হাতে তিনি বন্দী হলেন। সব কিছু লুটপাট ক'রে নিয়ে সে তাকে সস্ত্রীক হত্যা করলো।

॥ নয় ॥

বাকী চঘানীয়ানীর বিদায় বাবরের ভাগ্য ও পরিবেশকে তার নিজের মুঠোয় এনে দিলো। রাজ্যের উপর, আমীরদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলো তার অপ্রতিহত কর্তৃত্ব। সারাজীবন এই-ই চেয়ে এসেছেন বাবর। এতদিনে তার সে আকাঙ্খা পূর্ণ হলো।

এবার তিনি মন দিলেন রাজ্যকে আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। তার সাম্রাজ্য গঠনের আকাঙ্খা রূপায়ণের পথ সাবলীল ক'রে তুলতে। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যাযাবর তুর্কেমান হজারাদের দমন অভিযানে বার হলেন। এদের দস্যুবৃত্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ কাবুল থেকে পাঞ্জাব যাতায়াতের পথ নিরাপত্তাবিহীন ক'রে তুলেছিল। একটি ছোট সৈন্যদল নিয়ে তিনি জঙলীকে তাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেখানে তারা শীতের ছাউনি ফেলে বাস করছিল তখন। সমগ্র ছাউনি ঘেরাও ক'রে প্রচুর সংখ্যায় ভেড়া ও ঘোড়া ছিনিয়ে নিলেন। যে উদ্দেশ্যে এ অভিযান তা পুরো সফল হলো।

কিন্তু ঠাণ্ডায় ও কঠিন পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্যে ভাঙন দেখা দিল। ১৫০৬ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী সায়েটিকায় গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হলেন তিনি। পুরো চল্লিশ দিন বিছানায় পড়ে থাকলেন।

অসুস্থ থাকাকালে জহাঙ্গীর মীর্জার কার্যকলাপ বাবরকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুললো। জহাঙ্গীর মীর্জার মনে ধারণা দেখা দিয়েছে, তার প্রতি বাবর ন্যায় বিচার করেননি। তাকে যথেষ্ট কম জায়গীর দেয়া হয়েছে। তার এই অসন্তোষের আগুনে ধুনো দিয়ে চলেছেন আয়ুবের দুই ছেলে য়ুসুফ ও বুহলুল। এরা দু'জনেই মুঘল। এদের প্ররোচনায় জহাঙ্গীর কাবুল থেকে গজনী পালিয়েছেন। সেখানে নানি দুর্গ আক্রমণ ক'রে তাকে দখল ক'রে নিয়েছেন। সকলের ধন সম্পদ লুটপাট ক'রে তাদের মধ্যে কতককে হত্যা করেছেন। ক্রমশঃ দুশ্চরিত্র হয়ে উঠেছে সে। হয়ে উঠেছে মদ্যপ ও নারী সঙ্গ লোলুপ। হজারা অঞ্চল পেরিয়ে গিয়ে সে কতক মুঘল গোষ্ঠীর সাথে যোগ দিয়েছে। চেষ্টা ক'রে চলেছে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের সক্রিয় ক'রে তুলতে। বাবরের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল, তার শত্রুরা এই সুযোগে জহাঙ্গীর মীর্জাকে তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাতে আবার না তৎপর হয়ে ওঠে।

এমন সময় খুরাসান থেকে সুলতান হুসেন মীর্জা বঈকারার দূত এল। শইবানি খানের উপর তৈমুরবংশীয়দের সম্মিলিত আক্রমণের জন্য তিনি বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ বাবরের নিজের মনের কথা। অতএব সাথে সাথে সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। পরিকল্পনা নিলেন, যাবার পথে জহাঙ্গীর মীর্জার মুখোমুখি হবেন। হয় তার বিরুদ্ধাচরণের পথ রুদ্ধ করবেন, নয়তো তাকে অনুগত ক'রে তুলবেন। কিন্তু, বাবর সসৈন্যে এগিয়ে আসছেন শুনে বামিয়ান থেকে পালিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন জহাঙ্গীর মীর্জা।

সহসা পিছন থেকে আক্রমণ ক'রে যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে এজন্য উশতুর শহরে কোষাধ্যক্ষ ওয়ালীর জিম্মায় ভারী তল্পিতল্পা রেখে বাবর এগিয়ে চললেন। খমার্দ পৌছে আইমাকদের ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে জহাঙ্গীর মীর্জার সঙ্গে তাদের যোগ দেবার পথ রুদ্ধ করলেন। অবশেষে জহাঙ্গীর মীর্জাও তার আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিলেন। খমার্দে তার সৈন্যবাহিনী যখন ঘুরী ও দহান এলাকায় খাদ্যশস্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত এমন সময় বাবর খবর পেলেন সুলতান হুসেন মীর্জা বঈকারা মারা গেছেন। তবুও খুরাসান এগিয়ে চললেন তিনি। পথে তিনি খবর পেলেন তার ছোট ভাই নাসির মীর্জা বদকশান থেকে (সে ইতিমধ্যে বাবরকে ছেড়ে বদকশান গিয়ে সেখানকার স্বাধীন সুলতান হয়েছে) শইবানি খানের উজবেগ সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছে ও হুসেন মীর্জার উত্তরাধিকারীরা শইবানি খানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর। শুনে উৎসাহের সাথে এগিয়ে চললেন বাবর। সুলতান হুসেন মীর্জার উত্তরাধিকারী বদী-উজ্জমান মীর্জা ও মুজফ্‌ফর হুসেন মীর্জাও বাবরের কাছে দূত পাঠালেন অবিলম্বে এগিয়ে এসে তাদের সাথে যোগ দেবার জন্য।

১৫০৬ অব্দের ২৬শে অকটোবর মুরঘ-আব নদী তীরে বদী-উজ্জমান ও মুজফ্‌ফরের সৈন্য শিবিরে পৌছলেন তিনি। দুই নতুন সুলতানের সাথে দেখা হলো বাবরের। তারা বেশ ধুমধামের সাথে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাকে। কিন্তু কতক আভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য তারা তাদের আক্রমণ পরিকল্পনা পিছিয়ে দিলেন। ফিরে চললেন রাজধানী হীরাটে। বাবরকেও আমন্ত্রণ জানালেন যাবার জন্য। হীরাট দেখার জন্য খুবই উৎসুক ছিলেন বাবর। এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন তিনি। গেলেন হীরাট। কুড়ি দিন কাটালেন সেখানে।

সুলতান হুসেন মীর্জার উত্তরাধিকারীদের সংস্পর্শে এসে বাবর অনুভব

করলেন তারা অতি রুচিবান ও সংস্কৃতিবান হলেও রাজনীতির অনুপযুক্ত। তারা কষ্টসহিষ্ণুও নন, যুদ্ধেও অভিজ্ঞ নন। ভোগবিলাসে অতিমাত্রায় অভ্যস্ত। সুতরাং শইবানি খানের সাথে প্রতিযোগিতায় এরা এঁটে উঠতে পারবেন না। শইবানি খান অতি সহজেই খুরাসান দখল ক'রে নেবেন। অথচ এদের সেজন্য যেন কোন দুশ্চিন্তাই নেই। সুতরাং নিরাশ হয়ে কাবুল ফেরার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তিনি। মীর্জারা তার আদর আপ্যায়নে কোন ত্রুটি না করলেও তার সৈন্যদের জন্য শীতকালীন আবাসের কোন ব্যবস্থা করলেন না। এ জন্যও তার পক্ষে হীরাট বাস কষ্টকর হয়ে পড়লো। অবশেষে ১৫০৬ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর শীতকালীন আবাস সন্ধানের অজুহাতে হীরাট ত্যাগ করলেন তিনি।

হিম বরফের জন্য পথে নিদারুণ কষ্টভোগ ক'রে, অশেষ দুর্গতির মধ্যে পার্বত্য এলাকা পেরিয়ে ১৫০৭ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বাবর য়ক-আউলাঙ এসে পৌঁছলেন। পরের দিনই যাত্রা শুরু ক'রে বামিয়ানের মধ্য দিয়ে এলেন জঙলীক। অল্প বিশ্রাম নেবার পর ঠিক করলেন তুর্কেমান হজারাদের শীতকালীন ডেরা আক্রমণ করবেন তিনি। বাবরের আগমন সংবাদ তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকায় তারা তার যাবার পথের ধারেই ছাউনি ক'রে ছিল। চুরি, ডাকাতি ক'রে জনজীবন বিত্রস্ত ক'রে চলছিল। আচমকা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। ঘোড়া ও জিনিষপত্র ফেলে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গকে নিয়ে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। কতক বন্দী হলো সৈন্যদের হাতে।

পাহাড়মালা ডিঙিয়ে উপত্যকা পার হয়ে বাবর এরপর তৈমুর বেগের লঙরে পৌঁছলেন। এখানে এসে ঠিক করলেন হজারা চোর ডাকাতদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তিনি এই উপজাতিদের সতর্ক ক'রে দেবেন। কিন্তু কাসিম বেগের হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের প্রাণদণ্ড মকুব ক'রে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

হজারাদের দমনকালেই বাবরের কাছে কাবুলের পরিস্থিতি সম্পর্কে এক উদ্বেগজনক খবর পৌঁছালো। তিনি জানতে পারলেন তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। কতক আমীর মুহম্মদ হুসেন মীর্জা দুঘলাতের সাথে যোগ দিয়ে মীর্জা খানকে সুলতান ঘোষণা ক'রে কাবুল দুর্গ অবরোধ করেছে।

'তারিখ-ই-রসিদি' ইতিহাস গ্রন্থের লেখক মীর্জা হায়দার দুঘলাতের পিতা মুহম্মদ হুসেন মীর্জা দুঘলাত ছিলেন সম্পর্কে বাবরের কাকা। বাবরের এক মাসীকেও বিয়ে করেছিলেন তিনি। খুরাসান যাবার বেলা বাবর তার উপরেই

কাবুলের শাসনভার চাপিয়ে গিয়েছিলেন। মুহম্মদ হুসেন মীর্জা তুঘলাত ছিলেন অতি সৎ প্রকৃতির লোক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুরোধে বাবরের শেষপর্যন্ত শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন লেখকের বিবরণ পর্যালোচনা করলে এ বিদ্রোহের জন্য কোনমতেই তাকে দায়ী করা চলে না। পাকেচক্রে শেষ পর্যন্ত তিনি এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর মূল উৎস ছিলেন বাবরের সৎ-মাতামহী শাহ বেগম। তার বড় মেয়ে সুলতান নিগর খনীমকেই বিয়ে করেছিলেন সুলতান হুসেন মীর্জা।

বাবরের দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং খবরা-খবর আদান প্রদান না চলার সুযোগ নিয়ে হজারা তুর্কেমানরা রটিয়ে দেয় যে বাবরকে খুরাসানের নতুন উত্তরাধিকারীরা বন্দী করেছেন। তিনি ইখতিয়ার-উদ্দীন দুর্গে বন্দী ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। বাবরের মুঘল আমীররা এ খবর পেয়ে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে। শীতকাল শুরু হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাবর যখন ফিরলেন না কিংবা তার কাছ থেকে কোন সংবাদ এলো না, তখন শাহ বেগম ও মুঘল আমীরদের অনেকেই ধরে নিলেন, বাবর প্রকৃতই খুরাসানে জ্ঞাতিশত্রুর হাতে বন্দী হয়েছেন এবং বেঁচে নেই। এই পরিস্থিতিতে শাহ বেগম তার প্রিয় নাতি, মীর্জা খানকে কাবুলের সিংহাসনে বসাবার জন্য ব্রতী হলেন। যে উদ্দেশ্যেই হোক, মীর্জা খানও এসময় বাবরের সাথে অভিযানে না গিয়ে শাহ বেগমকে দেখাশোনার জন্য কাবুলেই ছিলেন। মুঘল আমীররা প্রায় সকলেই শাহ বেগমের এই ইচ্ছায় সায় দিলেন। কিন্তু সুলতান হুসেন মীর্জা তুঘলাত এতে সায় দিতে না পেরে দূরে সরে রইলেন। মীর্জা খানের সমর্থকরা তার নামে 'খুতবা' পাঠ ক'রে তাকে সুলতান ঘোষণা করলেন। বাবরের অনুগামীদের হাত থেকে রাজ্যের দখল নেবার জন্য করা হলো কাবুল দুর্গ অবরোধ। সুলতান হুসেন মীর্জার উপরও শাহ বেগম ও অন্যান্যরা চাপ দিয়ে চললেন মীর্জা খানকে সমর্থনের জন্য। পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত তিনি মীর্জা খানের পক্ষ নিলেন। বাবরের অনুগামীরা দুর্গ রক্ষা ক'রে চললেন। চললো উভয় দলের মধ্যে নিয়মিত সংঘর্ষ। ২৪ দিন এরূপ অবরোধ চলার পর বাবর এসে পড়লেন।

আগেই বলেছি, এ ঘটনার খবর যখন বাবরের কাছে পৌঁছয় তিনি তখন হজারাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রত। সাথে সাথে তিনি পদক্ষেপ নেবার জন্য তৎপর হলেন। কাশিম বেগের ভৃত্য অন্দিজানের মহম্মদকে পাঠানো হলো

কাবুল দুর্গে। খবর দেয়া হলো : সাহায্যের জন্য ক্ষিপ্র গতিতে তিনি এগিয়ে আসছেন। ঘুর-বন্দ গিরিপথ পার হয়ে তিনি অতর্কিতে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মিনার পর্বত পার হবার পর আগুন জ্বালিয়ে তিনি তার আগমন সংবাদ দুর্গের অনুগামীদের জানিয়ে দেবেন। তারাও যেন দুর্গের চূড়ায় আগুন জ্বালিয়ে তার প্রত্যুত্তর দেয়। তারপর উভয়ে একসাথে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে।

ওই পরিকল্পনা মতো আক্রমণ ক'রে বিদ্রোহীদের ঘায়েল করা হলো। মনে মনে প্রচণ্ড ভাবে ক্ষুব্ধ হলেও শাহ বেগম, সুলতান মুহম্মদ হুসেন মীর্জা দুঘলাত বা মীর্জা খান কারো উপর কোন প্রতিশোধ নিলেন না বাবর। শাহ বেগমের সাথে আগের মতোই ভালোবাসা মাখা ব্যবহার করলেন তিনি। আগের মতোই শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখালেন। সুলতান মুহম্মদ হোসেন মীর্জা দুঘলাতকে খুরাসান চলে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। মীর্জা খানকে প্রথমে তার বড় বোনের সাথে বাস করার অনুমতি দিলেন ও পরে কন্দহার গিয়ে সেখানে বাস করার নির্দেশ দিলেন।

শাহ বেগম ও মাতৃকুলের আত্মীয় পরিজনদের মুখে কিছু না বললেও কিংবা আচার-ব্যবহারে কোন বিরূপ ভাব প্রকাশ না করলেও, জীবনী গ্রন্থ মধ্যে কিন্তু বাবর তাদের এ আচরণের জন্য তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ বিদ্রোহের জন্য শাহ বেগম ও তার আত্মীয় পরিজনদেরই তিনি দোষী করেছেন। এই ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে সব কথা বলেছেন তা থেকে আমরা জানতে পাই, বাবরের দুর্দিনের সময়ে তার ও তার মায়ের প্রতি মামাদের আচরণের তুলনায় তাদের দুর্দিনে মাতৃকুলের প্রতি তার আচরণ কতো উদার ও শালীন ছিল। মোঙ্গল খান-ভাইদের দুর্বিপাকের পর মাতৃকুলের যারাই তার কাছে কাবুলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের প্রত্যেককেই তিনি সসম্মানে স্থান দিয়েছিলেন, সম্মান অনুযায়ী জায়গীর প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বাবর যখন তার চরম দুর্দিনে মামাবাড়ি আশ্রয় নেন তখন তারা তাকে তো দূর কথা তার মাকেও সসম্মানে থাকার জন্য একখানি গ্রামও মঞ্জুর করেননি। ক্ষোভের সুরেই প্রশ্ন তুলেছেন বাবর 'কেন? আমার মা কি য়ুনস খানের মেয়ে নন? *আমি কি তার নাতি ছিলাম না?'*

বিদ্রোহ নির্মূল ক'রে প্রজাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের দিকে মনদিলেন বাবর। রাজ্য মধ্যে স্বাভাবিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ ফিরিয়ে এনে, নজর দিলেন

তারপর বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন পার্বত্য উপজাতিদের বশে আনার দিকে। এদের ক্রিয়াকলাপ প্রায়ই তার রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টের কারণ হয়ে উঠছিল। এজন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। আক্রমণ করলেন বারান, চাষ-তুপ এবং গুল-ই-বহার অঞ্চল। অভিযান সফল হলো তার।

এ সময়েই মৃত্যু হলো দ্বিতীয় ভাই জহাঙ্গীর মীর্জার। ফলে, তাকে ঘিরে অহরহ যে দুশ্চিন্তার পাকে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল তা থেকে রেহাই পেলেন বাবর। ছোট ভাই নাসির মীর্জার দিক থেকেও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটলো। যে আমীররা তাকে নিয়ে বদকশানের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন তারাই আবার তার প্রতি বিরূপ হয়ে সেখান থেকে হটালেন তাকে। তাড়া খেয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় আবার তিনি বাবরের আশ্রয় নিলেন। পূর্ব অপরাধ মার্জনা ক'রে বাবর আবার তাকে কাছে টেনে নিলেন। আগে জহাঙ্গীর মীর্জাকে যে অঞ্চল দিয়েছিলেন সেই গজনীর শাসন-কর্তৃত্ব তাকে অর্পণ করলেন বাবর। আপন রাজ্যে বাবরের কর্তৃত্ব এবার প্রশ্নাতীত হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে খুরাসান সম্পর্কে বাবরের অনুমান ও আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হলো। নতুন উত্তরাধিকারী দু-ভাইয়ের রাজনৈতিক ও সামরিক অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে শইবানি খান খুরাসান দখল ক'রে নিলেন। এরপর তিনি মসহদ-ও জয় ক'রে নিলেন আবুল মহসিন মীর্জা ও কুপুক মীর্জার কাছ থেকে।

শইবানি খানের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্য অবশিষ্ট রাজাদের আতঙ্কিত ক'রে তুললো। তার দৃষ্টিও এবার পড়লো গিয়ে জমিনদাওয়া ও কন্দহারের প্রতি। এ দুটি এ পর্যন্ত খুরাসানের অধীন-রাজ্য ছিল। কাবুলের স্থিতি নিয়েও দুশ্চিন্তা দেখা দিল।

কন্দহারের শাহ বেগ ও মুকীম বেগ অরগুন শইবানি খানের আক্রমণ আশঙ্কা ক'রে বাবরের কাছে দূত পাঠালেন। প্রস্তাব দিলেন জোটবদ্ধ হয়ে উজবেগদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য। আমীরদের সাথে পরামর্শ ক'রে বাবর এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন কন্দহার।

যখন কলাত পার হয়ে শিবির ফেললেন, মীর্জা খান এবং অবদুর রজ্জক মীর্জা এসে তার সাথে যোগ দিলেন। একদা তারা কাবুলের সিংহাসনের দাবীদার হয়েছিলেন বটে। কিন্তু বর্তমানে বাবর সম্পূর্ন সুপ্রতিষ্ঠিত। তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস ও যোগ্যতা কোনটাই তাদের নেই। সুতরাং

তাদের আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হলেন না বাবর। এখান থেকে তিনি তার আগমন সংবাদ দিয়ে কন্দহারে দূত পাঠালেন অরঘুন ভাইদের কাছে।

অরঘুন ভাইরা আক্রমণ আশঙ্কায় তটস্থ হয়ে বাবরের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর সাথে সাথে শইবানি খানের সাথেও আলোচনা জুড়ে দিয়েছিলেন। কেননা, বাবর যে এতো সহজে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে প্রস্তাবিত অভিযানে তাদের সামিল হতে চাইবেন তা তারা কল্পনা করতে পারেননি। ফলে বাবরের উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের মনে গভীর সংশয় দেখা দিল। তার সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা শইবানি খানের আধিপত্য মেনে নেয়াই এক্ষেত্রে তারা বেশি নিরাপদ বলে বিচার ক'রে বসলেন। এবং সেই মতোই কাজ করলেন তারা।

বাবরের এতো সব কথা জানবার নয়। তিনি অরঘুন ভাইদের ক্রমাগত চাপ দিয়ে চললেন দেখা ক'রে অভিযান পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য। কিন্তু তারা এমন ভাষায় উত্তর দিতে বা চিঠি দিতে শুরু করলেন যেন বাবর তাদের অধীন কোন আমীর। বার বার এভাবে প্রত্যাখ্যাত হবার পর বাবর মেজাজ হারিয়ে ফেললেন, এগিয়ে চললেন এর সমুচিত উত্তর দেবার জন্য। খলিশকের উলটো-দিকে, খাল পেরিয়ে কন্দহারের তৃণাঞ্চলে পা দিয়ে তিনি তার চরের মুখে খবর পেলেন, শত্রু বাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছে। বাবর মাত্র দু' হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছেন। তার মধ্যে অর্ধেক ভেড়া, গরু ও অন্যান্য খাদ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে গেছে। সঙ্গের এক হাজার সৈন্যও পথশ্রমে ক্লান্ত ও অপ্রস্তুত অবস্থায়। কিন্তু দমে যাওয়া বা ভয় পাওয়া বাবরের স্বভাব বিরুদ্ধ। সুতরাং সেই সামান্য সৈন্যকেই এক একজন নায়কের অধীনে দশ ও বিশজনের দলে ভাগ ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এ সৈন্যরাও ছিল আবার বহু জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত। প্রতিপক্ষ শাহ বেগের অধীনে ছয় থেকে সাত হাজার সৈন্য। তারা বাবরের শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু বাবরের সেনারা অবিচল ভাবে তাদের প্রতিহত ক'রে চললো। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে শাহ বেগের সৈন্যেরা পালাতে শুরু করলে। দুর্গের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাবার দরুন, দুর্গ রক্ষার জন্য এগিয়ে যাওয়াও শাহ বেগ ও মুকীম বেগের পক্ষে সম্ভব হলো না। বাবর এ সুযোগে কন্দহার দুর্গের দিকে এগিয়ে চললেন। যুদ্ধে বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে সেখানকার সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল। বেশিক্ষণ দুর্গ প্রতিরোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। দুর্গ রক্ষক আহমদ আলী তরখান নিরাপদে চলে যেতে দেবার সর্তে দুর্গ সমর্পণ

করলেন। বিপুল ধনসম্পদ বাবরের অধিকারে এলো। তিনি উদার ভাবে তা অনুগামীদের মধ্যে বেঁটে দিলেন। এই ধনসম্পদের মধ্যে ঘোড়া, উট, খচ্চর, প্রচুর মূল্যবান রেশম বস্ত্র, মিহি সূতীবস্ত্র, মূল্যবান পোষাকাদি ও অঢেল রৌপ্য মুদ্রা ছিল। এতো মুদ্রা যে গণনার বদলে ওজন ক'রে বেঁটে দেয়া হলো। অবশ্য দুর্গের মধ্যে যে সম্পদ ছিল তা আহমদ আলীর দখলে রাখার অনুমতি দেয়া হলো। বিজিত দেশের ভার নাসির মীর্জার হাতে দিয়ে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে কাবুল ফিরে এলেন বাবর।

কাবুল ফিরে বাবর জানতে পেলেন, শাহ্ বেগ ও মুকীম বেগের অনুরোধে শইবানি খান কন্দহার এগিয়ে চলছেন হীরাট ও কন্দহারের মধ্যবর্তী পার্বত্য এলাকা দিয়ে। যে বিপুল ধনসম্পদ বাবরের হাতে পড়েছে তা কেড়ে নেবার জন্য শইবানি খান অতি দ্রুত এগিয়ে চলছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত অনুগামী কাশিম বেগের পরামর্শে বাবর সোজা কাবুল চলে আসায় তার সে পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। কন্দহার পৌঁছে শইবানি খান দেখলেন বাবর ধনসম্পদ নিয়ে তার পূর্বেই কাবুল ফিরে গেছে। তবু তিনি দুর্গ অবরোধ করলেন। মাত্র কিছুদিন হলো দুর্গ নাসির মীর্জার দখলে এসেছে। সুতরাং দুর্ধর্ষ উজবেগ বাহিনীকে প্রতিরোধ ক'রে দুর্গ দখলে রাখা অসম্ভব বুঝে তিনি কিছু বিশ্বস্ত অনুগামীর হাতে দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে কন্দহার ত্যাগ করলেন। চলে এলেন গজনী। কিন্তু দুর্গ যখন দখলে আসার অবস্থায় ঠিক তখনই সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে শইবানি খান অবরোধ তুলে নিয়ে কন্দহার ত্যাগ করলেন। কন্দহার এসে তিনি জানতে পারলেন তার কতক আমীর নীরহ্-তু-তে বিদ্রোহ করেছে ও তার হারেম ও দুর্গ দখল ক'রে নিয়েছে। এ সংবাদে বিচলিত হয়েই তিনি সম্ভবতঃ এ সময়ে কন্দহার ত্যাগ করেন। এছাড়া ধনসম্পদ লুণ্ঠিত কন্দহারের এরূপ একটি দূরবর্তী দুর্গও তিনি সম্ভবতঃ নিজ দখলে রাখার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। কিন্তু তার প্রস্থানের ফলে বাবর এক বিরাট বিপদের হাত থেকে বাঁচলেন। তার রাজ্যের অবস্থানের দিক থেকে তার কাছে কন্দহারের মূল্য ছিল অপরিসীম। এটি শইবানি খানের মতো দুর্ধর্ষ ব্যক্তির হাতে চলে যাওয়া মানেই কাবুলের স্থিতি বিপন্ন হয়ে পড়া।

শইবানি খানের কন্দহার আক্রমণের খবর বাবরের মতো দুঃসাহসীকে পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে তুললো। শক্তির দিক থেকে শইবানি খানের কাছে তিনি শিশু। কন্দহার বিজয়ের পর তিনি নিশ্চয়ই কাবুল বিজয়ের জন্য এগিয়ে

আসবেন। সুতরাং এ সময়ে কাবুলে থাকা তিনি মোটেই নিরাপদ মনে করলেন না। কী করবেন তা ঠিক করার জন্য তিনি আমীরদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন। কাশিম বেগ ও শেরীম তঘাই তাকে বদকশান চলে যাবার পরামর্শ দিলেন। অন্য কতক পরামর্শ দিলেন হিন্দুস্তানে চলে যাবার জন্য। শেষ অবধি ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপটেমবরে বাবর হিন্দুস্তানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাবার বেলা তিনি অবদুর রজ্জক মীর্জার উপর কাবুল দুর্গের ভার অর্পণ করলেন। আর শাহ বেগমের অনুমতি নিয়ে মীর্জা খানকে পাঠালেন বদকশানে।

বাবরকে রাজ্য ছেড়ে সিন্ধুনদের দিকে পালাতে দেখে কাবুল ও লমঘানের মধ্যবর্তী আফগান উপজাতিরা তার পথ অবরোধের জন্য তৎপর হয়ে উঠল। একদিন ভোরে যখন তিনি জগদালিক থেকে এগিয়ে চলেছেন, দেখলেন খিজর খইল, শিমু খইল, খিরিলচী ও খুগীয়ানী উপজাতির আফগানরা জগদালিক গিরিপথ দিয়ে তার যাবার পথ অবরোধ ক'রে রয়েছে। তারা উত্তর দিককার পাহাড়মালার উপরে তাদের সৈন্য সমাবেশ করেছে। রণভেরী বাজিয়ে, গভীর কোলাহল তুলে এগিয়ে আসছে। বাবর সাথে সাথে তার বাহিনীকে পাহাড়ে চড়ে সব দিক থেকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। বাবরের সৈন্যদের ওই ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে আফগানরা একটা তীরও না ছুঁড়ে রণভঙ্গ দিল। বাবর এবার পাহাড় থেকে নেমে এলেন। থামলেন এসে নিঙ-নহা তুমানে থাকা অদীনপুর (জালালাবাদ) দুর্গে। সৈন্যবাহিনীকে চার দলে ভাগ ক'রে তিনি এবার তাদের বিভিন্ন দিকে আফগান অঞ্চল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের জন্য পাঠালেন। এবং এই পন্থায় তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে তুলতে চাইলেন। এভাবে তিনি শামুকের গতিতে আফগান অঞ্চল পার হয়ে চলতে থাকলেন। মন্দ্রাবর উপস্থিত হয়ে তিনি সেখানে মুকীমের মেয়ে মাহ-চুচুকের সাথে কাশিম কুকুলদাসের বিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে পশাঘরের মোল্লা বাবাকে পাঠালেন সেখানকার খবর আনবার জন্য। এ সময়ে চাঘান-সরাই নদীর পশ্চিম পারে থেকে, তিনি আতর, শীব, কুনার ও নূর-গল অঞ্চল লুটপাট ক'রে চললেন। শীতের মাঝামাঝি তার কাছে খবর এলো, দুর্যোগ কেটে গেছে, শইবানি খান কন্দহার অধিকার না করেই ফিরে গেছেন। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বদ-ই-পিচের সড়ক ধরে কাবুল ফিরে এলেন বাবর।

রাজ্যে ফিরে এসে আবার বাবর প্রশাসনিক দিকে মন দিলেন। নাসির মীর্জা ও আবদুর রজ্জক মীর্জার কাবুল উপস্থিতি তার নিজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও

স্থিতির পক্ষে ক্রমশ বিঘ্নের কারণ হয়ে উঠছে দেখে নাসির মীর্জাকে আবার গজনী পাঠিয়ে দিলেন সেখানকার শাসনভার অর্পণ ক'রে। অবত্নর রজ্জককে পাঠালেন নতুন বিজিত আফগান অঞ্চলে সেখানকার শাসনভার দিয়ে।

তিনি কন্দহারে অরঘুনদের পরাজিত করেছেন। আফগানরাও তার বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিয়েছে। বর্তমানে একমাত্র তিনিই তৈমুরবংশীয়দের নেতৃস্থানীয়। শইবানি খান ফিরে যাবার ফলে বহির্শত্রুর হাত থেকেও তিনি নিরাপদ। এই সব কারণ থেকেই সম্ভবতঃ তিনি এ সময়ে গৌরবসূচক 'পাদিশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। এসময়ে, ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ পুত্র হুমায়ুনেরও জন্ম হয়।

বেশিদিন শান্তিতে কাটানো বাবরের ভাগ্যে ঘটলো না। কিছুকালের মধ্যেই কাবুলের দক্ষিণ-পশ্চিমে সীমান্তের মেহমন্দ আফগানরা মুকুরের কাছে বিদ্রোহের পতাকা তুললো। সাথে সাথে তাদের দমনের জন্য সেখানে ছুটে গেলেন বাবর। অভিযান থেকে ফিরে আসার বেলা কুজ বেগ, ফকীর আলী, করীম দাদ, বাবা চুহরা ও অন্যান্য মুঘল বেগেরা জোটবদ্ধ হয়ে বাবরকে ছেড়ে চলে যাবার চক্রান্ত করলো। সময়মতো খবর পেয়ে চক্রান্তকারীদের বন্দী করলেন বাবর। তাদের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। শেষে কাশিম বেগের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি তাদের প্রাণদণ্ড মকুব ক'রে বন্দী ক'রে রাখলেন।

এর পরে পরেই আর এক বিরাট চক্রান্তের শিকার হলেন বাবর। এর ফলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার আশংকা দেখা দিল। তার কাবুলে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হিসার ও কুন্দুজ থেকে আসা খুসরাউ শাহের পূর্বতন অনুগামী মুঘল ও চাঘতাই বেগের দল এবং দু থেকে তিনহাজার তুর্কেমান সৈন্য নিয়ে সিউনতুক ও শাহ-নজর বেগ জোটবদ্ধ ভাবে বাবরের আনুগত্য বর্জন করে, অবত্নর রজ্জক মীর্জাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাতে মনস্থ করলেন। এছাড়া কুন্দুজ ও খুটলান সহ খুসরাউ শাহের পূর্বতন রাজ্যও তার হাতে অর্পণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই প্রথম চাঘতাই, মুঘল ও তুর্কেমানরা সম্মিলিত ভাবে বাবরের বিরুদ্ধে পতাকা তুলল। এর কারণও ছিল। বাবর সর্বদাই ওদের লুটপাটের প্রবৃত্তিকে কঠোর ভাবে দমন ক'রে এসেছেন। শাসনক্ষেত্রেও তিনি তাদের কোনরকম হস্তক্ষেপ বা প্রাধান্য অর্জনের সুযোগ দিতেন না। তিনি সর্বদাই সেনাবাহিনী মধ্যে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যস্ত। ইদানীং তিনি আবার 'পাদিশাহ' উপাধিও গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তার অধীনে থেকে

তারা যে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবেন না, তা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন সকলে। সুতরাং বাবরকে সরিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছিলেন তারা।

১৫০৮ অব্দের মে মাসে মেহমন্দ আফগানদের দমন করার অভিযান থেকে ফেরার পথে বাবর এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। কিন্তু প্রথমে তিনি এ সংবাদের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না। কিন্তু একদিন রাতে তিনি চার-বাগে দরবার কক্ষে থাকা কালে মুসা খাজা এসে খবর দিলেন মুঘলরা সত্যিসত্যিই বিদ্রোহ করেছে। বাবর সাথেসাথে বাগ-ই-যুরুন চক ও বাগ-ই-খিলওয়াত ছুটলেন হারেম রক্ষার জন্য। অতি কষ্টে তিনি শেষ অবধি সেখানে পৌঁছতে পারলেন। দেখলেন, তার অনুগামীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চারদিকে বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। সকলেই পাগলের মতো কাবুল ছুটে চলেছে নিজেদের পরিবারবর্গকে রক্ষার জন্য। ঠিক এরূপ নাটকীয় পরিস্থিতিতেই বাবরের কলম আবার থেমে গেছে। এবং দীর্ঘ এগারো বছরের জন্য। এতএব এ সময়কার ঘটনা জানার জন্য আমাদের অন্যদের বিবরণের শরণাপন্ন হতে হয়।

ফেরিস্তা ও কাফী খানের বিবরণ থেকে জানা যায়ঃ ব্যাপক দলত্যাগ ফলে তার সেনাবাহিনী ক্ষীণ হয়ে গেলেও তিনি অবিলম্বে তাদের সংঘবদ্ধ ক'রে এই অভ্যুত্থান রুখতে এগিয়ে যান। দীর্ঘকাল মরিয়া সংগ্রামের পর বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিতে তিনি সফল হন। আবদুর রজ্জক তার হাতে বন্দী হলেও পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি আবার বাবরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। এবার বাবর আর তাকে ক্ষমা করলেন না। বন্দী ক'রে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। মুঘলরা এ সময় থেকে কখনো আর বাবরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ক'রে সফল হতে পারেনি। চাঘতাই মুঘলরাও ক্রমশঃ তাদের প্রাধান্য খোয়াতে থাকে। মুঘলেরা ছাড়া অন্যান্য সব উপজাতির প্রজারাই বাবরকে তার সহজাত প্রতিভা, গুণাবলী ও হৃদয় বৃত্তির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমর্থন ক'রে চলেন।

১৫০৮ অব্দের শেষ ভাগ ও ১৫০৯ অব্দে বাবর কোন অভিযানমূলক ক্রিয়াকলাপে ব্রতী হয়েছিলেন এরূপ খবর পাওয়া যায় না। এ থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে যে এ সময়ে তিনি আপন রাজ্যের প্রশাসন নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অপরদিকে বুখারাতে গিয়ে মীর্জা খান সেখানকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

এ সময়কার স্মরণীয় ঘটনা মধ্যে একটি হলো ছোটমামা সুলতান আহমদ খানের এক ছেলে সুলতান সৈদ খান চাঘতাইয়ের বাবরের কাছে আশ্রয় গ্রহণ। আরেকটি হল সুলতান হুসেন মীর্জা দুঘলাতের ছেলে মীর্জা হায়দার দুঘলাতের বাবরের কাছে আগমন। হায়দার তখন মাত্র এগারো বছরের বালক। শইবানি খান তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু আপন এক ভৃত্যের সহযোগিতায় পালিয়ে এসে তিনি বাবরের শরণার্থী হন।

১৫১০ অব্দের ২রা ডিসেম্বর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটলো। পারস্যের শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মার্ভেতে শইবানি খান শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হলেন ও মর্মান্তিক ভাবে তার মৃত্যু হলো। এ ঘটনার খবর বাবর প্রথম পেলেন মীর্জা খানের কাছ থেকে। অবশ্য শইবানি খান মারা গেছেন কিনা সে খবর সে নিশ্চিতভাবে জানাতে পারলো না। সে তার চিঠিতে লিখলো: "শাহি বেগ (শইবানি) খান মারা গেছেন কিনা সে কথা জানা নেই। সব উজবেগরা আমু নদীর ওপারে চলে গেছে। মুঘল ঔরুস দুরমান পর্যন্ত কুন্দুজ থেকে পালিয়েছে। প্রায় কুড়ি হাজারের মতো মুঘল উজবেগদের দল ত্যাগ ক'রে মার্ভ থেকে কুন্দুজে এসেছে। আমিও সেখানে এসেছি।" এই সুযোগে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টার ব্রতী হবার জন্য সে বাবরকে তার সাথে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালে। এর চেয়ে আনন্দকর আমন্ত্রণ বাবরের কাছে আর কিছুই হতে পারে না। সাম্রাজ্যের স্বপ্ন তার মনে আবার বিচিত্র বর্ণ হয়ে দেখা দিল। নাসির মীর্জার উপর কাবুলের ভার দিয়ে তিনি সাথে সাথে সমরকন্দের দিকে যাত্রা করলেন। প্রখর শীতের মধ্যে সাধ্য মতো দ্রুত গতিতে আব-দর গিরিপথ পার হয়ে বামিয়ানে গিয়ে ঈদ-উৎসব পালন করলেন। কুন্দুজ পৌছলেন গিয়ে জানুয়ারী ১৫১১ অব্দের আরম্ভে।

শেরিম তঘাই আয়ুব বেগচিক প্রভৃতি যে সব মুঘল আমীর এ সময় পর্যন্ত বাবরের অনুগামী ছিলেন তারা বর্তমান রাজনৈতিক ওলট-পালট পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আবার মুঘল রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। হাতের কাছে বাবরের নিকট অশ্রিত সুলতান সৈদ চাঘতাই-কে পেয়ে তাকে মুঘলদের খান পদে বসাবার নিষ্পত্তি গ্রহণ করলেন। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বাবরকে হত্যার চক্রান্ত শুরু করলেন তারা। কিন্তু সুলতান সৈদ চাঘতাইয়ের কাছে এ প্রস্তাব রাখতেই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। উপকারী বাবরের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হতে রাজী হলেন না তিনি। বাধ্য হয়ে তারা বাবরকে

হত্যার পরিকল্পনা ছেড়ে দিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, ঠিক এ সময়েই অন্দিজান থেকে হায়দার মীর্জা দুঘলাতের কাকা বাবরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। তিনি তখন উজবেগদের তাড়িয়ে অন্দিজান অধিকারের জন্য চেষ্টা ক'রে চলছিলেন। তার আবেদনে সাড়া দিয়ে বাবর সুলতান সৈদ ও মুঘল আমীরদের সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। ১৫১১-র ১৩ই মে তারা সেখানে সুলতান সৈদকে খান-পদে বসালেন।

বাবর কিছুকাল কুন্দুজে বিশ্রাম নিয়ে, শীতকাল পার হবার পর মীর্জা খানকে সাথে নিয়ে আমুনদী পার হয়ে হিসার দুর্গ অধিকারের জন্য অভিযান শুরু করলেন। কিন্তু সে চেষ্টায় বিফল হলেন তিনি। ফিরে এলেন আবার কুন্দুজে।

এ সময়ে পারস্যের শাহ ইসমাইল সফবীর দূত বাবরের বড়ো বোন খানজাদা বেগমকে নিয়ে কুন্দুজে বাবরের কাছে উপস্থিত হলেন। খানাজাদা বেগমের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বামী শইবানি খান ও সঈদ হাদী দুজনেই মার্ভের যুদ্ধে মারা যান। খানজাদা বেগম পড়লেন পারসিকদের হাতে। শাহ তাকে বাবরের বোন বলে জানতে পেরে সসম্মানে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন তার সম্পত্তি ও পরিচারিকা সহ।

শাহর কাছ থেকে শুভেচ্ছার নিদর্শন পেয়ে বাবর এই সুযোগে তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দিকে মন দিলেন। বোনের প্রতি শাহ যে সম্মান ও সৌজন্য দেখিয়েছেন সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে উপযুক্ত উপহারসম্ভার-সহ মীর্জা খানকে তার কাছে পাঠানো হলো। অভিনন্দন জানাতেও ভুললেন না উভয়ের চরম শত্রু শইবানি খানকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করার জন্য। সহযোগিতা চাইলেন পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার কল্পে।

শাহ ইসমাইল সফবী রাজী হলেন। চুক্তি সম্পাদিত হলো। কিছুদিনের মধ্যেই সৈয়দ মহম্মদ মীর্জার কাছ থেকে খবর এলো, তিনি ফরঘান থেকে উজবেগদের হটিয়ে দিয়েছেন। বাবর উৎসাহিত হলেন। হিজরী ৯১৭ বা ১৫১১-১২ অব্দে তিনি কুন্দুজ ছেড়ে সসৈন্যে আবার হিসার অভিযানে এগিয়ে চললেন। সুরখ-আব নদী তীরে ছাউনি ফেলে অপেক্ষা ক'রে চললেন শাহের সাহায্যের জন্য। প্রায় মাস খানেক অপেক্ষা করার পর মীর্জা খান শাহের কাছ থেকে এক বিরাট সাহায্যকারী সেনা নিয়ে বাবরের সাথে যোগ দিলেন।

শইবানি খানের মৃত্যুর পর তার ছেলে তৈমুর সুলতান উজবেগ প্রধান

নির্বাচিত হলেন না। উজবেগরা তাদের প্রচলিত প্রথা মতো আবুল খৈর-এর ছেলে কুচুন সুলতানকে প্রধানের পদে বসালেন। শইবানি খানের বিশাল সাম্রাজ্য যাতে তাদের হাতছাড়া না হয় এজন্য শইবানি খানের বংশধর ও পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে তা বেঁটে দেয়া হলো। সুতরাং অপ্রতিরোধ্য শইবানি খানের মৃত্যু হলেও তার ফলে উজবেগরা দুর্বল হয়ে পড়লো না। বরং একের বদলে অনেকে এবার ঐক্যবদ্ধ হলেন তার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য। হিসার ও চঘানীয়ান পড়েছিল হম্‌জ সুলতান ও মেহদী সুলতানের ভাগে। আর সমরকন্দ তৈমুর সুলতানের ভাগে।

উজবেগরা বাবরের অগ্রগতির খবর পেলেন। জানতে পেলেন শাহের সাথে তার চুক্তির কথাও। সুতরাং শাহের পাঠানো মূল সেনাবাহিনী বাবরের সাথে যোগ দেবার আগেই তারা বাবরকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য প্রায় মাসখানেক পর একদিন ভোরে তারা সুরখ-আব নদী সাঁতরে পার হলেন। বিকাল নাগাদ গুপ্তচরের মুখে সে খবর জানতে পেলেন বাবর। সাথে সাথে আব-দরার খাড়া ও সংকীর্ণ পর্বতমালা মধ্যে সরে গেলেন তিনি। সারা রাত ও পরদিন দুপুর পর্যন্ত পিছু হটে যুদ্ধের উপযুক্ত একটি স্থানে পৌছে সেখানে সৈন্য সমাবেশ করলেন। উজবেগ বাহিনীর একাংশ তৈমুর সুলতানের অধীনে এগিয়ে এসে পাহাড়ে চড়ার চেষ্টা শুরু করলো। প্রায় দশহাজার সৈন্য। তাদের বাধা দেবার জন্য বাবর সাথে সাথে মীর্জা খানের অধীনে এক বাছাই সেনা-দল পাঠালেন। উজবেগরা আক্রমণ ক'রে মীর্জা খানকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ ক'রে দিল। এমন সময় বাবরের নির্দেশে মীর্জা হায়দারের অনুগামী মীর্জা মুঘল সেনাবাহিনী তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। এরা সংখ্যায় ছিল প্রায় তিন হাজার। এরা মূলতঃ মুহম্মদ হুসেন মীর্জা দুঘলাতের অনুগামী। তার মৃত্যুর পর খুরাসান থেকে পালিয়ে কুন্দুজে এসে তার ছেলে মীর্জা হায়দারের সাথে যোগ দিয়েছিল। মীর্জা হায়দার তখন সবে ১২ বছরের বালক। তাই তাকে নিজের সাথে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে তার সেনাবাহিনীকে বাবর মীর্জা খানকে সাহায্যের জন্য যাবার আদেশ করলেন। জানি আহমদ আটকার নেতৃত্বে এই বাহিনী মীর্জা খানকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে গিয়ে উজবেগদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আসন্ন সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেলেন মীর্জা খান। জানি আহমদ আটকার আক্রমণে উজবেগরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে পিছু হটে গেল। কয়েকজন উজবেগ নেতা বন্দী হলেন। বাবরের কাছে নিয়ে আসা হলো তাদের।

একে শুভ লক্ষণ রূপে বিচার ক'রে বাবর বন্দীদের মীর্জা হায়দার তুঘলাতের নামে উৎসর্গ করার আদেশ দিলেন।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চললো। দুই পক্ষই হেস্তনেস্ত করার জন্য মরিয়া। বাবর যেখানে আস্থান নিয়েছেন সেখানে যাবার পথ খুবই সংকীর্ণ। কাজেই প্রতিপক্ষ সহজে তাকে ভেদ করার সুযোগ পেল না। এ ছাড়া এখানকার ভূ-প্রকৃতিও সহজভাবে চলাফেরার উপযুক্ত ছিল না। জলের অভাবেও উজবেগদের দুর্গতির সীমা রইলো না। তারা যেখানে সমবেত হয়েছেন তার চারদিকে চার পাঁচ মাইলের মধ্যে কোথাও জল নেই। বাধ্য হয়েই রাতে পিছু হটলেন তারা হমূজ সুলতানের নেতৃত্বে। যে উজবেগ বাহিনী মীর্জা খানের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে চলছিল তারা মূল বাহিনী নিয়ে হমূজ সুলতানকে পিছু হটতে দেখে দমে গিয়ে নিজেরাও সেই পথ ধরলো। সুযোগ পেয়ে মীর্জা খান এবার প্রবল বিক্রমে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করলো তৈমুর সুলতানের বাহিনী। মূল বাহিনীও ওই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। তারাও এবার পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। যুদ্ধে জিতে গেলেন বাবর। হমূজ সুলতান, মেহদী সুলতান, হমূজ সুলতানের ছেলে মামক বন্দী হলেন। মুঘল, খাকান ও চাঘতাই সুলতানদের প্রতি উজবেগরা যে রকম আচরণ করেছে ঠিক সেই আচরণই করা হলো তাদের প্রতি। রক্তের বদলে রক্তে তার প্রতিশোধ নেওয়া হলো। প্রাণ দিতে হলো বন্দীদের। রাত থেকে শুরু ক'রে সকাল পর্যন্ত সমান ভাবে পিছু তাড়া ক'রে দরবন্দ-ই-অহীনন (লৌহ ফটক)-এর দেয়াল পর্যন্ত হটিয়ে দেয়া হলো উজবেগদের। হিসার-সাদমর, খুটলান, কুন্দুজ ও বাঘলানের দুর্গগুলি বাবরের অধিকারে এলো।

এই বিজয় সংবাদ জানিয়ে বাবর এবার শাহের কাছে সমরকন্দ জয়ের জন্য সহযোগিতা চাইলেন। শাহ সর্ত-সাপেক্ষে তাকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। এই সর্তগুলি হলো ঃ সমরকন্দ সহ তার রাজ্যের সর্বত্র বাবরকে শাহের নামে 'খুতবা' পাঠ করতে হবে। মুদ্রারও প্রচলন করতে হবে শাহের নামে। এছাড়া রাজ্য মধ্যে সিয়া মতবাদের প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।

সমরকন্দ জয়ের স্বপ্ন সফল করতে হলে শাহের সাহায্য জরুরী বুঝেই সম্ভবতঃ বাবর তার শর্ত মেনে নিলেন। নতুন বিজিত রাজ্যসমূহে তিনি শাহের নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনে রাজী হলেন। শাহকে এক পত্র দিয়ে

জানালেন, তিনি মুদ্রার উপর শুধু দ্বাদশ ইমামের মূর্তিই ছাপবেন না, নিজেও শীয়া পোষাক পরবেন ও উজবেগদের ধ্বংস করার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। শাহ এতে সন্তুষ্ট হয়ে বাবরকে সাহায্যের জন্য আহমদ বেগ সফবী, আলীখান ইস্তিলজ্‌ ও শাহরুখ সুলতান আফশার প্রভৃতির অধিনায়কত্বে ছয় হাজার সেনার এক বাহিনী পাঠালেন তার কাছে।

. ষাট হাজার সেনার বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বাবর এবার বুখারা ও সমরকন্দের দিকে এগোলেন। আতঙ্কিত হয়ে উজবেগরা পালিয়ে যেতে থাকলো। অনায়াসে খোজার ও অন্যান্য অঞ্চল অধিকার করলেন তিনি। উজবেগ প্রধানরা পিছু হটে সমরকন্দ গিয়ে বাবরকে প্রতিরোধ করার উপায় নির্ধারণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বাবর এবার বুখারায় প্রবেশ করলেন। যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে উবায়েদুল্লহ খানকে সেখান থেকে পালাতে বাধ্য করলেন। তার ও তার বাহিনীর সর্বস্ব লুটে নেয়া হলো। উজবেগরা পালিয়ে গিয়ে তুর্কীস্তানের মরু অঞ্চলে আশ্রয় নিলো। উবায়েদুল্লহ খানের পরিণতি সমরকন্দে জমায়েত উজবেগ প্রধানদেরও ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে তুললো। বাবরকে বাধা দেয়ার সাহস হারিয়ে ফেললেন তারা। তাড়াতাড়ি সমরকন্দ ত্যাগ ক'রে তারাও তুর্কীস্তানের মরু অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ১৫১১ অব্দের ৯ই অকটোবর বাবর তৃতীয়বার সমরকন্দ প্রবেশ করলেন। সেখানকার সর্বস্তরের অধিবাসীরা তাকে উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা জানালেন, আনন্দের সঙ্গে বরণ ক'রে নিলেন। সবাই আশা করলেন— তার অধীনে এবার তারা সুখে-শান্তিতে দিন কাটাবেন।

বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে সমরকন্দ প্রবেশ করলেন বাবর। দ্বাদশ ইমামের নামে খুতবা পাঠ করা হলো, মুদ্রা প্রচলিত করা হলো। পারসিক সৈন্য-বাহিনীকে উদারভাবে পুরস্কৃত ক'রে বিদায় দিলেন তিনি। আনন্দ উৎসবের মধ্যে পরবর্তী আটমাস সেখানেই কাটালেন।

সমরকন্দের সিংহাসনে বসার পর পারস্যের শাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাবরকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিল। এখানকার অধিবাসীরা মূলতঃ সুন্নী সম্প্রদায়ের। তারা বাবরের শীয়া প্রীতিকে মোটেই ভালো চোখে দেখল না। বাবর নিজের ভুল বুঝতে পারলেও তিনি অসহায়। একা একা উজবেগদের দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা তার নেই। সুতরাং রাজ্যের স্বার্থে শাহের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা ক'রে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফলে তার কার্যকলাপ দিন দিন প্রজাদের

অখুসী করে চললো। তার প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা, তার কাছ থেকে বিরাট আশা মুছে গেল তাদের মন থেকে। দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় তিনি তার যে বিরাট ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন সমরকন্দবাসীদের মধ্যে তা এবার শূন্যে মিলিয়ে গেল। দিন দিন অপ্রিয় হয়ে চললেন তিনি। বাধ্য হয়েই তিনি এবার তুর্কেমানদের সমর্থনের দিকে ঝুঁকে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সুরু করলেন।

সমরকন্দবাসীদের মনোভাব প্রকৃত পক্ষে বাবরকে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিল। তিনি না পারছেন শাহের সাথে চুক্তির শর্তগুলি আন্তরিকভাবে পালন করতে, না পারছেন প্রজাদের বোঝাতে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুনই তাকে বাধ্য হয়ে এ পথ বেছে নিতে হয়েছে, সুযোগ পেলেই তিনি শাহের আনুগত্য বর্জন করবেন। ফলে প্রজাদের সাথেও যেমন তার ঠাণ্ডা লড়াই সুরু হলো, তেমনি ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হলো, পারস্যের শাহের সাথেও। বাবরের উপর তার আধিপত্য প্রদর্শনের জন্য অল্প কয়েকমাসের মধ্যেই শাহ তার এক সভাসদকে সমরকন্দ পাঠালেন। তার মাধ্যমে তিনি বাবরকে তার পদমর্যাদার উপযুক্ত খেতাব দান করলেন এবং সমরকন্দ ও বুখারার শাসক রূপে স্বীকৃতি জানিয়ে ফরমান জারী করলেন। মীর্জা খানকে স্বীকৃতি দিলেন শাদমান, খুটলান ও বদকশানের শাসক রূপে। এতে বাবর এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়লেন। কিন্তু পরিস্থিতিকে আপাততঃ নীরবে মেনে নিলেন তিনি। আহমদ বেগ ও সাহরুখকে দিয়ে শাহের কাছে উপহার পাঠালেন। শাহের সভাসদ মুহম্মদ জান ইসাককে ইচ্ছে ক'রেই আটকে দিলেন তিনি।

শাহ প্রথম থেকেই কতক পারসিককে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সমরকন্দে মোতায়েম রেখেছিলেন। তারা যখন দৈনন্দিন শাসনকার্যেও নিয়মিত হস্তক্ষেপ সুরু করলো তখন বাবর অতিষ্ঠ হয়ে মহম্মদ জান ইসাককে জানিয়ে দিলেন যে শাহ তার প্রতি যে সব অনুগ্রহ দেখিয়েছেন তাতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নন। ইসাক গোপনে সে সংবাদ শাহকে জানালেন। তার কাছ থেকে পাওয়া সংবাদ থেকে শাহ ধারণা করলেন বাবর বিদ্রোহ করার সুযোগ খুঁজছে।

এদিকে সমরকন্দের সুন্নী অধিবাসীদের প্রতি পারসিকদের নৃশংস মনোভাব, পীড়নমূলক কার্যকলাপ ও ধর্মীয় অন্ধ উন্মাদনামূলক ক্রিয়াকলাপ বাবরকে ব্যথিত ও অসহিষ্ণু ক'রে তুললো। তিনি এবার জোর ক'রে তার পারসিক সমর্থকদের বরখাস্ত করলেন। সুন্নী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও সন্ত ব্যক্তিদেরও তিনি অভিযুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তার স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী ও শাহের

হাতের পুতুল হয়ে কাজ ক'রে চলার অনিচ্ছার কথা বুঝতে পেরে ইসাক শাহের কাছে এ সম্পর্কে খবর পাঠালেন। শাহ সাথে সাথে বাবরকে বশে আনার জন্য সেনাপতি নজম-উস-সানিকে আদেশ দিলেন।

এগারো হাজার সৈন্য নিয়ে নজম-উস-সানি, জইনুল অবদিন বেগ সফবী, পীর বেগ কজর ও বিদিনজান রুমুলু সমরকন্দ যাত্রা করলেন। তারা সমরকন্দ যাত্রার অল্পকাল মধ্যেই সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন গতি নিলো। পারসিকদের বিতাড়িত করা হয়েছে ও শাহের সাথে বাবরের বিরোধ চলছে এ খবর উজবেগদের কাছে পৌঁছতে দেরি হলোনা। উবায়েদুল্লহ খান সাথে সাথে তার নষ্টরাজ্য উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। তারা তাসকিণ্ট ও বুখারা আক্রমণের জন্য এগিয়ে এলেন। এই দ্বিমুখী অভিযানের ফলে দুই রণক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলা করার চাপের মধ্যে পড়ে গেলেন বাবর। তখন তার বিশ্বাস-ভাজন অনুগামীর সংখ্যা সীমিত। তবু উজবেগদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। তাদেরই একাংশকে পাঠালেন তাসকিণ্ট, তৈমুর সুলতানের গতিরোধ করার জন্য। বাবর নিজে যত যা সৈন্য সংগ্রহ করতে পারলেন তা নিয়ে এগোলেন বুখারার দিকে। মুহম্মদ মজীদ তরখান অবশ্য বারবার তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না তা।

বাবর ভেবেছিলেন উজবেগরা সংখ্যায় খুব অল্প। তিনি দ্রুত এগিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে সহজেই কাবু ক'রে ফেলতে পারবেন তাদের। তার অনুমান অবশ্য সত্য হলো! উবায়েদুল্লহ খান বাবরের অগ্রগতির সংবাদ পেয়েই তাড়াতাড়ি পিছু হটতে থাকলেন। বাবর তাকে পিছু তাড়া ক'রে চললেন এবং কুল-ই-মলিক পৌঁছে ধরে ফেললেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন যে এই পিছু পালিয়ে আসা বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটাতে ইতিমধ্যে তৈমুর সুলতান ও জানি বেগ একটি শক্তিশালী দল নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

বাবর পিছু তাড়া ক'রে এখন এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন যে তার পিছু হটা বেশ কষ্টকর। যা হয় হবে, এই মনোভাব থেকে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। যুদ্ধে প্রচুর উজবেগ সেনা প্রাণ হারালে।। বন্দী হলো ঔরুস বেগ, কুপুক বেগ, আমীর খাজা কিকরাত এবং আরো কতক উজবেগ নেতা। বাবরের নির্দেশে তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হলো। অপরদিকে উজবেগরাও শত্রুপক্ষের লোকদের গায়ের চামড়া তুলে নিলো, বধ ও বন্দী করলো। শেষ

পর্যন্ত বাবর নিদারুণ ভাবে পরাজিত হলেন এ যুদ্ধে। বুখারায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন তিনি। ১৫১২ অব্দের এপ্রিল-মে মাসের ঘটনা এসব।

উজবেগরা প্রচণ্ডভাবে পিছু তাড়া ক'রে আসার দরুন বুখারায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লো বাবরের পক্ষে। রাজধানী সমরকন্দে চলে এলেন তিনি। এসে দেখেন সেখানকার পরিবেশও সম্পূর্ণরূপে তার বিপক্ষে। তাদের কাছে তিনি ইতিমধ্যেই অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। সুতরাং তার সাথে তারা কোনরকম সহযোগিতার মনোভাব দেখালেন না। এ অবস্থায় শত্রুকে বাধা দেবার মতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়লো। বাধ্য হয়ে পরিবারবর্গ ও তল্পিতল্পা নিয়ে হিসারের দিকে রওনা হলেন তিনি। বুখারা আবার উজবেগদের দখলে চলে গেল। বাবরের বয়স এ সময়ে তিরিশের নিচে। এ বছরের জুলাই-আগস্ট মাস নাগাদ তারা বাবরকে হিসার থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য যাত্রা করলো।

হিসার পৌঁছে বাবর সেখানে দৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। পরেস্যের শাহ ইসমাইল সফবীর কাছে দূত পাঠালেন এ বিপর্যয়ের খবর দিয়ে। তাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়ে চললেন সাহায্যের জন্য। অগত্যা শাহ নজম-উস-সানিকে নির্দেশ দিলেন বাবরের সাথে সহযোগিতা করার জন্য। ইতিমধ্যে মীর্জা খানের সাহায্য নিয়ে তিনি হিসার নগরীর চার পাশে পরিখা খুঁড়ে ফেলেছেন। বালখের ওয়ালী বা শাসক বৈরাম বেগ করমনলুর কাছে সাহায্যের অনুরোধ করায় তিনিও তিনশো সেনা পাঠিয়েছেন। উজবেগরা এসে দেখলে যে বাবর মরিয়াভাবে মরণ-পণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। অতএব আক্রমণ পরিকল্পনা ছেড়ে মুয়ারন-উন-নহরে ফিরে গেলেন তারা।

নজম-উস-সানি যখন খুরাসানে পৌঁছে বালখে ছাউনি ফেলে আছেন এমনি সময়ে তার কাছে শাহের জরুরী নির্দেশ পৌঁছাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাবরের সাহায্য করতে এগিয়ে যাবার জন্য। তিনি সাথে সাথে বাবরকে মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য, শাহের অপরিমেয় বদান্যতার খবর দিয়ে তার কাছে আমীর ঘয়াসুদ্দীনকে পাঠালেন। অনুরোধ করলেন তার সেনাদল নিয়ে তীরমীজে পারসিক বাহিনীর সাথে মিলিত হবার জন্য। দরবন্দ-ই-অহনীনে মিলিত হলেন দুজনে। শাহের পক্ষ থেকে তারা বাবরকে সংবর্ধনা জানালেন। উভয়ে একত্র হয়ে তখন এগিয়ে চললেন খোজার। খোজার দখল ক'রে এগোলেন করশী। বিদ্যুতবেগে ঝাঁপিয়ে পরে তাও দখল ক'রে নিলেন।

এরপর মিলিত বাহিনী এগিয়ে গেল বুখারার দিকে। বুখারার নিকটবর্তী এক মরুভূমির কাছে অবস্থিত ঘজদ্ওয়ান পৌঁছে সেখানকার দুর্গ অবরোধ করলেন। তৈমুর সুলতান বিক্রমের সাথে দীর্ঘ চারমাস তাদের প্রতিরোধ ক'রে চললো। বাবরের অগ্রগতি উজবেগদের বিপর্যয়ের কারণ হবে বুঝে উজবেগ শাসকরা জোটবদ্ধ হয়ে ইতিমধ্যে উবায়দুল্লাহ খান ও জানি বেগের নেতৃত্বে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে দুর্গরক্ষার জন্য এগোলেন। তৈমুর সুলতানও দুর্গ থেকে সকলের অজানাভাবে এসে তাদের সাথে যোগ দিলেন।

নজম-উস-সানির সেনানায়ক অভিজ্ঞ কামালুদ্দীন মহম্মদ এবং বাবর এ জাতীয় মিলিত আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাকে আগে থেকেই সতর্ক ক'রে চলছিলেন। কিন্তু নজম-উস-সানি তাদের কথায় প্রথমে কান দিলেন না। যখন দিলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অবরোধ প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলেন পারসিক বাহিনীকে চারদিক থেকে উজবেগরা ঘেরাও করেছে। ১৫১৪ অব্দের ২২শে অকটোবর সংঘর্ষ শুরু হলো। পারসিক বাহিনী বহুক্ষণ ধরে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত উজবেগদের কাছে এঁটে উঠতে পারল না। নজম-উস-সানি উজবেগদের হাতে বন্দী হয়ে প্রাণ হারালেন। যে সব পারসিক প্রধানরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে খুরাসান ফিরলেন তাদের মধ্যে কতক অসন্তুষ্ট শাহের হাতে বন্দী হয়ে প্রাণ দিলেন।

পারসিক ঐতিহাসিকেরা পারসিক বাহিনীর এ পরাজয়ের জন্য বাবরকে দায়ী ক'রে গেছেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলেই মনে হয়। কেননা নজম-উস-সানি প্রথম থেকেই বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর বর্বরোচিত আচরণ ক'রে চলেছিলেন। বাবরকেও তিনি কার্যতঃ প্রায় বন্দীই করেছিলেন। তার কোন অনুরোধ ও উপদেশেই তিনি পূর্বাপর কান দেননি। এক্ষেত্রে এই অভিযানে বাবরের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। তিনি অসহায় দর্শকে পরিণত হয়েছিলেন মাত্র। পারসিক সেনাপতির অদূরদর্শিতাই পারসিকদের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। এ বিপর্যয় তার পক্ষে রোধ করা সম্ভব নয় বুঝেই সম্ভবতঃ পারসিক বাহিনীর বিপর্যয় শুরু হতে বাবর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যান ও শাদমান হিসারে গিয়ে আশ্রয় নেন।

দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরলো বাবরকে। নভেম্বর মাসে তার অনুগামী মুঘলরা আবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। ইয়াদগার মীর্জা, নাসির মীর্জা, আয়ুব বেগচীক ও মহম্মদের নেতৃত্বে তারা হঠাৎ বাবরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বস্ত্র

অনুগামীকে হত্যা করলো। যা পারলো লুটপাট ক'রে তিগিন প্রস্থান করলো। এ বিদ্রোহের সঠিক কারণ অবশ্য জানা যায় না। ফেরিস্তার বিবরণ অনুসারে মুঘলদের লুটপাটের প্রবৃত্তিই এর মূল কারণ। বাবর কঠোর ভাবে তাতে বাধা দিয়ে চলার দরুনই তারা ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করে।

বহু কষ্টে হিসার দুর্গে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচালেন বাবর। উজবেগদের প্রাধান্য যে সময় অপ্রতিহত ভাবে বেড়ে চলেছে, এবং নিজে গভীর বিপদের আবর্তে, এ সময় দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি বিধান তার পক্ষে অসম্ভব বুঝে সামান্য কিছু অনুগামীকে হিসার রেখে, মীর্জা খানের কাছে কুন্দুজে এলেন বাবর। তিনি স্থান ত্যাগ করার পর হিসারের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষ, তুষারপাত ও মুঘলদের লুটপাটের দরুন গভীর দুর্দশার কবলে পড়লো। ফলে বুখারার শাসক উবায়েদুল্লহ খান মুঘলদের তাড়িয়ে হিসার দখল ক'রে নেবার জন্য উদ্যোগী হলেন। সফলও হলেন তিনি। এভাবে হিসারও হাতছাড়া হয়ে গেল।

বাবরের পরবর্তী কয়েক মাসের কার্যকলাপ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। খওয়ান্দ-আমীরের বিবরণ অনুসারে তিনি এ সময় খিসমে অতিবাহিত করেন। কিন্তু মীর্জা হায়দার দুঘলাতের বর্ণনা অনুসারে তিনি কুন্দুজেই থেকে যান। এ সময়ে তাকে গভীর দুর্দশা ও অর্থকষ্ট সইতে হয়। এ অঞ্চল তখন মীর্জা খানের অধীনে। তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে তা দখল ক'রে নিতে চাইলেন না বাবর।

যখন বাবর নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন যে এ ভাবে এখানে অপেক্ষা ক'রে চলা অর্থহীন, বর্তমান পরিস্থিতিতে হিসার ও সমরকন্দ পুনরুদ্ধার তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তখন তিনি কাবুল রওনা হলেন। অল্প কিছু অনুগামীকে নিয়ে হিন্দুকুশ পেরিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। বিরাট জাঁকজমকের সাথে ভাই নাসির মীর্জা তাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানালেন।

মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন এভাবেই শেষ পর্যন্ত খান খান হয়ে গেল বাবরের।

তবে, এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে বাবর একটি পরম শিক্ষা লাভ করলেন। তা হলো: ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না করার শিক্ষা। সব ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণু ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা।

॥ দশ ॥

মীর্জা খানের ডাকে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের অভিযানে যাবার বেলা কাবুল শাসনের ভার নাসির মীর্জার উপর দিয়ে যান বাবর। অনুগত থেকে আন্তরিকতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করার জন্য তার প্রতিদান রূপে বাবর তাকে গজনী প্রদেশ দিলেন। নানারকম সম্মান এবং অনুগ্রহও দেখালেন। গজনী গিয়ে নাসির মীর্জা এবার ভোগ-বিলাস-আনন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। অপরিমিত সুরাপানের দরুন অল্পকালের মধ্যেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো। পরের বছর (১৫১৫ খৃষ্টাব্দ) অসুখে পড়ে মারা গেলেন তিনি।

নাসির মীর্জার মৃত্যুর পরে পরেই, সম্ভবত গজনীতে মুঘল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মুঘল ও চাঘতাই আমীররা বিদ্রোহ ক'রে বসলো। তবে আগের দুবারের মতো এবারেও তারা শেষ রক্ষা করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত বাবর দমন করলেন তাদের।

এরপর কয়েকটি বছর শান্তিতেই কাটালেন বাবর। আনন্দ-উৎসব, সুরা-আসর, শিকার, আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও পার্বত্য-উপজাতিদের অনুগত রাখার জন্য ছোটখাট অভিযানের মধ্যে ডুবে থেকেই সময় কাটালেন তিনি। ১৫১৬ অব্দে গুলরুখ বেগচীকের গর্ভে তার তৃতীয় পুত্র আসকারীর জন্ম হলো।

প্রায় এই একই সময়ে বাবরও স্তাদ আলী নামের এক অটোমান তুর্কীকে সংগ্রহ করলেন। নিয়োগ করলেন তাকে সমরাস্ত্র অধিকর্তা রূপে। এ ঘটনার কিছুদিন আগে থাকতেই তিনি সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেন। কন্‌সতান্‌তিনোপলের সুলতান সালিমের সাথে যুদ্ধে পারস্যের শাহের পরাজয় এ বিষয়ে তাকে সচেতন ক'রে তোলে। এ যুদ্ধে সুলতান সালিম কামান ও ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন। এ সব আধুনিক অস্ত্রের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পেরে বাবরও এই আধুনিক যুদ্ধকৌশল গ্রহণের দিকে ঝুঁকলেন। তুর্কী গোলন্দাজ ও মাসকেট বন্দুক বা পলতে বন্দুক চালনায় অভিজ্ঞ সৈনিকদের সংগ্রহ ক'রে তিনি নিজের বাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধকৌশলে শিক্ষিত ক'রে তুলতে মন দিলেন। ১৫১৬-১৭ অব্দে তার এই নতুন পদক্ষেপ শুধু যে তার ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলে দিল তাই নয়, ইতিহাসের পাতায়ও তার নাম চিরস্মরণীয় ক'রে রাখলো।

কাবুল জয় করার পর থেকেই বাবরের মনে হিন্দুস্তানে সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন

দানা বেঁধে উঠেছিল। শইবানি খানের মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষদের রাজ্য উদ্ধারের জন্য মীর্জা খানের ডাক তাকে আবার মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মরীচিকা-আশার পিছনে ছুটিয়ে নিয়ে গেলেও এবারকার তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, সে আশা পূরণ হবার নয়। সেখানকার তীব্র প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক মঞ্চ স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ার উপযোগী নয়। তাছাড়া প্রবল প্রতাপ পারসিক সাম্রাজ্য ও ঐক্যবদ্ধ উজবেগদের সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো শক্তি-সামর্থ্যও তার নেই। তাই সে আকাঙ্খা মন থেকে পুরো মুছে ফেলে হিন্দুস্তানের দিকেই মনকে একাগ্র করলেন তিনি। সেজন্য পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করলেন। তবে তার পুরো পরিকল্পনা বা আকাঙ্খাকে অন্যদের কাছ থেকে সযত্নে গোপন রেখে চললেন।

আপন পরিকল্পনা সফল করার জন্য প্রথমেই বাবর কন্দহারের উপর নজর দিলেন। ইতিপূর্বে একবার তিনি কন্দহার জয় করলেও শইবানি খানের আক্রমণের দরুন তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। আবার তা অরঘুনদের অধিকারে চলে গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হলে কন্দহার একান্ত জরুরী। হিন্দুস্তানে যাবার সিধা সড়ক এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই চলে গেছে। অতএব ১৫১৭ অব্দে কন্দহার অভিযানে বার হলেন তিনি। কিন্তু অসুস্থতার ফলে সে অভিযান অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে হলো তাকে।

পরের বছর হিন্দুস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অভিযানে বার হলেন বাবর। বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত চাঘান-সরাই দুর্গ অধিকার করলেন। এ বছরের (১৫১৮) নভেম্বর মাসে কন্দহারের শাহ বেগ অরঘুনও সিন্ধুর দিকে নজর দিলেন। জাম নন্দের মৃত্যু ও তার নাবালক ছেলের সিংহাসনে আরোহণ ফলে যে আভ্যন্তরীণ কলহ দেখা দিয়েছে সেখানে তারই সুযোগ নিতে চাইলেন তিনি। এক হাজার ঘোড়সওয়ারের এক ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে কহন ও বাঘবন লুটপাট করলেন তিনি। অর্থাৎ বাবর ও অরঘুন দুজনেই প্রায় এক সময়ে হিন্দুস্তানের প্রবেশ-পথ পরিষ্কারে মনোযোগী হলেন।

এর কিছুদিন পরেই শাহ বেগ অরঘুনের ছেলে শাহ হুসেন অরঘুন পিতার সাথে ঝগড়া ক'রে বাবরের কাছে এলেন। বাবরও আগ্রহ দেখিয়ে সৌজন্য সহকারে আশ্রয় দিলেন তাকে। কন্দহার সম্পর্কে নানা খবর তার কাছ থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ পেলেন। তারপর তাকে কাছে ধরে রাখার জন্য এক চতুর

চাল চাললেন। বিয়ে দিলেন তার সাথে মীর খলীফার মেয়ে গুলবার্গের। ফলে শাহ হুসেন বাবরের কাছের-মানুষ হয়ে উঠলেন।

১৫১৮ অব্দের ডিসেম্বরে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন আফগানদের দমন করার জন্য বেরিয়ে ওই সুযোগে বাবর পাঞ্জাব অভিযান করেন। ওই সময়ে তিনি শিয়ালকোট পর্যন্ত এগিয়ে ফিরে আসেন। পরের বছরও আবার তিনি চন্দ্রভাগা নদী তীরে শিয়ালকোট পর্যন্ত গিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে এলেন। শাহ বেগ অরঘুন কাবুল আক্রমণ করার জন্যই তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন বলে সাধারণতঃ মনে করা হয়। তবে এ ধারণা সঠিক নাও হতে পারে।

১৫১৯ অব্দের শুরুতে ৪ঠা জানুয়ারী বাবর বাজৌর দুর্গ আক্রমণ করলেন। দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি এক বিশ্বস্ত দিলজাক আফগানকে বাজৌর-শাসক হায়দার আলী বা তার ভাইপোর কাছে পাঠালেন, দুর্গ সমর্পণ ক'রে তার অধীনতা স্বীকার ক'রে নেবার জন্য। কিন্তু তা করলো না তারা। ৬ই জানুয়ারী তিনি পদক্ষেপ নিলেন। বাঁ দিকের সেনাবাহিনীকে তিনি নদী পার হয়ে দুর্গ ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে তার উত্তরে গিয়ে দুর্গের কাছে আস্থান নেবার আদেশ দিলেন। মধ্য ভাগকে আদেশ দিলেন নদী পার হয়ে উত্তর পশ্চিমের অসমতল মালভূমিতে জমায়েত হবার জন্য। ডান ভাগের বাহিনীকে পশ্চিম দিককার নিচু ফটকের কাছে জমায়েত হতে বলা হলো। বাঁ ভাগের বাহিনী নদী পার হয়ে তারপর এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই শ'দেড়েক পদাতিক তীর-ধনুক নিয়ে আক্রমণ করলো তাদের। বাবরের বাহিনী তাদের অনায়াসে হটিয়ে দিলে।

এ যুদ্ধে বাবর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রতিপক্ষ বেশ অসুবিধায় পড়লো। এ নিয়ে বাবরেরও এই প্রথম পরীক্ষা। এর আগে বাজৌরের অধিবাসীরা কখনো তুফঙ্গ বা পলতে বন্দুক দেখেনি। প্রথম প্রথম তারা একে গ্রাহ্য করলো না। পরে যখন কামান থেকে অগ্নি-উদ্গার হতে দেখলো ভয়ে পিছু হটলো। এ সত্ত্বেও যথেষ্ট সতর্কতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলো না তারা। ব্যাপারটাকে উপভোগ্য এক মজার ঘটনা বলেই যেন মনে করলো সকলে। সেদিন উস্তাদ আলী পলতে বন্দুকের সাহায্যে পাঁচ জনকে ঘায়েল করলো। কোষাধ্যক্ষ ওয়ালীও দু-জনকে ঘায়েল করলো। অন্যান্য বন্দুকধারীরাও বেশ সাহস ও কুশলতা দেখালো। দিনের শেষে মোট দশজন বাজৌরী প্রাণ খোয়ালো। এবার তাদের বাহিনী মধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক খেলে গেল। কেউ আর তারপর দুর্গের বাইরে আসার সাহস করলো না।

পরদিন দুর্গ আক্রমণের আদেশ দেয়া হলো। বাঁ ও মধ্য বাহিনীর সেনারা দেয়ালে মই লাগিয়ে দুর্গ মধ্যে ঢুকে পড়লো। মহম্মদ আলী জাঙ্গজুঙ্গের নেতৃত্বে মূল বাহিনীও দুর্গে প্রবেশ করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্গের বাহিনীকে পরাস্ত ক'রে দুর্গ দখল ক'রে নেয়া হলো। সকলের স্ত্রী পুত্রদের বন্দী করা হলো। প্রায় তিন হাজার বাজৌরীকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হলো।

খাজা কলানের উপর বাজৌরের প্রশাসন ভার অর্পণ ক'রে মূল শিবিরে ফিরে এলেন বাবর। তাকে সাহায্যের জন্য সেখানে এক বিরাট সেনাবাহিনীকেও মোতায়েম রাখা হলো।

বাজৌর অধিকার বাবরের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখান থেকেই তার ভাগ্য স্মরনীয় বাঁক নিতে শুরু করে। সামরিক দিক থেকেও এই দুর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দুস্তানে অভিযান চালাবার জন্য এবার মূল শিবির রূপে ব্যবহার যোগ্য একটি স্থান বাবরের দখলে এলো। বিদ্রোহী আফগান উপজাতিদের বশে রাখবার দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট।

বাজৌরের প্রশাসন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত ক'রে ৮ই জানুয়ারী যাত্রা শুরু করলেন বাবর। বাজৌর উপত্যকার বাবা করা ঝরনার কাছে এসে ছাউনি ফেললেন। এখানে খাজা কলানের অনুরোধে কতক বন্দীকে ক্ষমা দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন তিনি। যে সব প্রধানরা অতি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন তাদের হত্যা করা হলো। বাজৌর জয়ের নিদর্শন রূপে তাদের ছিন্ন মুণ্ড কাবুল, বদকশান, কুন্দুজ ও বালখ পাঠিয়ে দেয়া হলো।

এখানে থাকাকালে ইউসুফজাই উপজাতির কাছ থেকে শান্তি-প্রস্তাব নিয়ে আগত দূতকে তিনি সম্মানিত করলেন। সম্মান-সূচক পোষাক উপহার দিয়ে তাকে বিদায় করলেন তিনি। তারই মারফত চিঠি দিয়ে ইউসুফজাই উপজাতির প্রধানদের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেবার আহ্বান দিলেন। ২১শে জানুয়ারী তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান উদ্দেশ্যে সাওয়াদ (স্বাত) উপত্যকার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাজৌর ও চন্দওয়াল নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ছাউনি ফেললেন। দূত মনসুর ইউসুফজাই আবার ফিরে এসে আফগান প্রধানদের অনিচ্ছার কথা জানালো। এগিয়ে এসে বাবর কহরাজ ও পেশগ্রাম উপত্যকার নিকটবর্তী পঞ্জকুরায় এলেন। প্রবেশ করলেন এভাবে সাওয়াদ। এখানকার প্রধান সুলতান আলাউদ্দীন আগেই এসে (১৯শে জানুয়ারী) তার সাথে দেখা করেন। আলাউদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান ওয়েইস সাওয়াদীও ইতিমধ্যে বাবরের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

পঞ্জকুরায় এসে বাবর সুলতান ওয়েইস সাওয়াদীর পরামর্শে কহরাজ উপত্যকার অধিবাসীদের উপর তার সৈন্যদের জন্য চার হাজার গাধাবোঝাই চাল কর চাপালেন ও তা আদায়ের জন্য সুলতান ওয়েইসকে পাঠালেন। এতো কর দেয়া সাধ্যের বাইরে বলে কৃষকরা তা দিলনা। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব দেখে বাবর পঞ্জকুরা লুট করার জন্য বিরাট এক সেনাবাহিনী সহ হিন্দু বেগকে আদেশ দিলেন। তিনি এগিয়ে যেতেই পঞ্জকুরা শহরের লোকেরা ভেড়া, খচ্চর, বলদ ও খাদ্যশস্য ফেলে যে যেদিকে পারলো পালালো। ২৬ ও ২৭শে জানুয়ারীও সন্নিহিত এলাকা থেকে এভাবে লুটপাট ক'রে আনার জন্য কুচ বেগের অধীনে সেনাদল পাঠানো হলো। এই লুট অভিযানকে মদত দেবার জন্য বাবর নিজেও কিছুটা এগিয়ে মানদীশ নামের একটি গ্রামে ছাউনি ফেললেন। এখানে ইউসুফজাই উপজাতির নেতা মালিক সুলেইমান শাহের ছেলে মালিক শাহ মনসুর তার সাথে দেখা করলো। মালিক তার দেশকে লুট-তরাজের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বাবরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনার উদ্যম করলেন। অন্যান্য প্রধানদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তার মেয়েকে বাবরের সাথে বিবাহ দেয়ার বাবর-উত্থাপিত প্রস্তাব মেনে নিয়ে তা কার্যকরী করলেন। বাবরকে তিনি খবর দিলেন যে তার উপজাতিদের কাছ থেকে কর সহ তার কন্যা বাবরের কাছে আসছে। ১৫১৯ অব্দের ৩০শে জানুয়ারী শাহ মনসুরের ভাই তার ভাইঝি বিবি মুবারিকাকে নিয়ে বাবরের শিবিরে উপস্থিত হলো। সেদিন সন্ধ্যাতেই বাবরের সাথে তার বিয়ে সমাধা হলো। এরপর কয়েকদিন সেখানে থেকে যথেষ্ট খাদ্যশস্য সংগ্রহ ক'রে সাওয়াদ (স্বাত) অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন তিনি।

৮ই ফেব্রুয়ারী বেগদের ও দিলজাক আফগানদের নিয়ে পরামর্শ সভা বসালেন বাবর। এখানে ঠিক হলো, যেহেতু বসন্তকালীন ফসলের সময় পার হয়ে গেছে, অতএব সাওয়াদ-এর ভিতর অঞ্চলে প্রবেশ করা এ সময়ে ঠিক হবে না। প্রয়োজনীয় খাদ্য নাও মিলতে পারে, গেলে অনর্থক হয়রান হতে হবে হয়তো সেনাদের। এর চেয়ে অম্বহর ও পানী-মানীর সড়ক ধরে এগিয়ে, হস-নগরের উপর-অঞ্চল দিয়ে সাওয়াদ (স্বাত) নদী পার হয়ে মহুরে বসবাসকারী ইউসুফজাই ও মহম্মদী আফগানদের উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়া যাক। এও ঠিক হলো, পুরো সেনাবাহিনী আগামী ফসল না ওঠা পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। বাবর

তখন বাজৌর দুর্গে ফিরে এলেন। স্ত্রী বিবি মুবারিকাকে দুর্গে রেখে যাত্রা শুরু করলেন। এলেন পানী-মানীতে। তারপর আরো এগিয়ে সাওয়াদ নদী পার হলেন। সারারাত ধরে তিনি এগিয়ে চললেন। পরদিন সকালে গুপ্তচয়ের মুখে খবর পেলেন যে তিনি এগিয়ে আসছেন জানতে পেরে অফগানরা পাহাড়ী পথ ধরে চারদিকে পালিয়ে যাচ্ছে। খবর পেয়ে দ্রুত এগিয়ে চললেন বাবর। তাদের ধরার জন্য এক আগুয়া বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। তারা ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর। বহু আফগানকে হত্যা করলো। বন্দীও করা হলো অনেককে। অনেক গরু-বলদ ভেড়া আটক করা হলো। আংশিক ভাবে সফল হয়ে বাবর কাতলাং চলে এসে সেখানে শিবির ফেললেন।

এবার ভীর-এর দিকে এগিয়ে চললেন বাবর। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বাবর লিখেছেন 'বাজৌর থেকে ফের যাত্রা শুরুর বেলা আমরা শুধু ভীর-এর কথাই ভাবছিলাম। (প্রথম) কাবুল আসার দিন থেকেই আমার নজর ছিল হিন্দুস্তানে এগিয়ে যাবার দিকে। কিন্তু নানা কারণে তা ক'রে ওঠা সম্ভব হয়নি এতকাল।'

ভীর থেকে যখন মাত্র ১৪ মাইল দূরে এ সময়ে বাবর নীল-আব ও ভীর-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জুনজুহা গোষ্ঠীর প্রধান মালিক হস্তের কাছে শান্তি প্রস্তাব দিয়ে লঙ্গর খানকে পাঠালেন। মালিক লঙ্গর খানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অতএব তার মন বাবর-অভিমুখী করতে লঙ্গর খানের বিশেষ অসুবিধা হলো না। লঙ্গর খানের সাথে এসে তিনি বাবরের সাথে দেখা করলেন ও বশ্যতার নিদর্শন রূপে একটি সুসজ্জিত ঘোড়া উপহার দিলেন।

এবার ভীর-এর দিকে এগিয়ে চললেন বাবর। বাবর লিখেছেন : 'অনেকদিন থেকেই আমার মন হিন্দুস্তান এবং ভীর, খুস-আব, চীন-আব (চেনাব বা চন্দ্রভাগা), চীনীউত ইত্যাদি যে সব দেশ একসময়ে তুর্কীদের দখলে ছিল তা অধিকার করার দিকে। এ অঞ্চলগুলিকে আমি নিজের বলেই ভাবতে শুরু করেছিলাম। শান্তিপূর্ন ভাবেই হোক আর জোর ক'রেই হোক এ অঞ্চলগুলিকে নিজের দখলে আনার সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম।' ইউসুফজাই আফগান-প্রধান মালিক মনসুর ও মালিক হস্তের বশ্যতা স্বীকার তাকে এবার উৎসাহিত ক'রে তুললো। এ পরিকল্পনা সফল ক'রে তোলা সম্ভবপর বলে মনে হলো তার। স্থানীয় জনসাধারণের মন জয় করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি তাই আদেশ

দিলেন ঃ সাধারণ মানুষের গায়ে যেন ভুলেও হাত তোলা না হয়। একটুকরো কাপড় বা একটা ভাঙ্গা সূঁচও যেন কেড়ে নেয়া না হয় কারো কাছ থেকে।

কল্‌দ-কহার পার হয়ে হমতাতু গিরিপথ ডিঙিয়ে ভীর শহরের দোরগোড়ায় পৌঁছলেন বাবর। পথে লোকেরা 'পেশকাশ' উপহার দিয়ে তার বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিলো। আবদুর রহিম শঘাওয়ালকে আগে থেকে 'ভীর' পাঠিয়ে তিনি অভয়বাণী শোনালেন, সতর্ক ক'রে দিলেন ঃ 'এদেশ প্রাচীন কাল থেকে তুর্কীরা শাসন ক'রে এসেছে। অযথা ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি ক'রে সকলের সর্বনাশ ডেকে এনোনা। এ দেশ, এখানকার মানুষদের আমরা আপনরূপে পেতে চাই, আক্রমণ বা লুটপাট করতে চাইনে।' সেনাবাহিনীকে এবার তিনটি শাখায় ভাগ ক'রে শহরের দিকে এগোতে থাকলেন বাবর। তার এই চাল বাজীমাৎ করলো। শহর-গোড়ায় তিনি পৌঁছতে না পৌঁছতেই আলী খান ইউসুফ খলিলের কর্মচারী হিন্দু বেগ স্থানীয় প্রধানদের নিয়ে বাবরের সাথে দেখা ক'রে তার বশ্যতা মেনে নিলেন।

২১ শে ফেবরুয়ারী বাবর ভীর পরিদর্শন করলেন। সেখানে সংগুর খান জনজুহাও তার বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিলেন। দুদিন পরে, ২৩ শে ফেবরুয়ারী ভীর-এর চৌধুরীরা তাদের সম্পত্তির মুক্তিপণ হিসাবে বাবরকে চার লক্ষ শাহরুখী দিতে রাজী হলো। এর পরেই এ অঞ্চলের বালুচীদের বশে আনার জন্য হায়দার আলমদারকে পাঠালেন বাবর। পরদিন তারাও বাবরের সাথে দেখা ক'রে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিন খুস-আবের অধিবাসীরাও তার আধিপত্য মেনে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। খুশী হয়ে বাবর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্য শাহ সুজা অরঘুনের ছেলে শাহ হুসেনকে সেখানে পাঠালেন।

এই অভাবিত সাফল্য বাবরের হিন্দুস্তান জয়ের আকাঙ্খাকে আরো উদ্দীপ্ত ক'রে তুললো। কর্মোৎসাহী ও উচ্চাশী আমীররাও এবার উৎসাহী হয়ে বাবরকে পরামর্শ দিলে ঃ হিন্দুস্তানের যেসব অঞ্চল একদা তৈমুরলঙ্গের সাম্রাজ্যাধীন ছিল সেসব অঞ্চলের বশ্যতা দাবী ক'রে সেখানে দূত পাঠান হোক। এ পরামর্শ মনে ধরলো বাবরের। সেই মতো ওই অঞ্চলগুলি হস্তান্তরের দাবী জানিয়ে সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও দৌলত খান লোদীর কাছে পত্র লিখলেন তিনি। মোল্লা মুরশীদ সে পত্র বয়ে নিয়ে গেলেন তাদের কাছে।

১৫১৯ অব্দে ইব্রাহীম লোদী তার ক্ষমতার তুঙ্গে। এ চিঠি পেয়ে তার

মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো, কী ধরনের উত্তর দিলেন তা সহজেই অনুমেয়। আর সে উত্তর শুনে বাবরের মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তা তার এই মন্তব্যগুলির মধ্যেই স্পষ্ট। 'হিন্দুস্তানের লোকেরা, বিশেষ ক'রে আফগানেরা বোধবুদ্ধির ধার ধারে না। বিচার বুদ্ধি ও সদুপদেশের প্রতি তারা পুরো চোখ-কান বোজা। শত্রু হিসাবেও কী ক'রে যে পদক্ষেপ নিতে হয়, শত্রুতাচরণ করতে হয়; তাও তারা জানে না। বন্ধুত্বের বিধিনিয়ম রীতিনীতিও জানা নেই তাদের।' অন্যদিকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী বাবরের দূতকে কোন সুস্পষ্ট উত্তর দেবার বদলে পাঁচমাস তাকে সেখানে দেরী করিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে বাবর বিজিত অঞ্চলে প্রচলিত জরীপ কার্য করলেন। সমগ্র অঞ্চলকে চারভাগে ভাগ ক'রে বিভিন্ন আমীরকে সেখানকার প্রধানদের কাছ থেকে বকেয়া কর আদায় করতে পাঠালেন। ৪ঠা মার্চ্চ তার কাছে চতুর্থ পুত্র হিন্দালের জন্মখবর পৌঁছল এসে। পরবর্তী কয়েকদিন তিনি আনন্দ পানোৎসব ক'রে কাটালেন। তবে তার মধ্যেও তিনি তার করণীয় কর্তব্যগুলি কিন্তু মোটেই ভুলে ছিলেন না, পুরো সতর্ক ছিলেন সেদিকে।

বিজিত অঞ্চলের শাসনভার হিন্দু বেগের উপর অর্পণ করলেন বাবর। সে যাতে সুষ্ঠুভাবে শাসনকাজ চালাতে পারে সেজন্য উপযুক্ত কর্মচারী ও সাহায্য-কারীর ব্যবস্থা ক'রে ১৫১৯ অব্দের ১৩ই মার্চ কাবুল ফিরে চললেন। স্থানীয় আমীর ও প্রধানদের সহযোগিতা সমর্থন লাভের জন্য তিনি তাদের সম্মানিত করলেন, তাদের ভাতাও বাড়িয়ে দিলেন।

ফেরার পথে কল্‌দ-কহার থামলেন বাবর গখ্‌খর উপজাতিকে পরাস্ত ক'রে নিজের বশে আনার জন্য। তাদের প্রধান হাতি গখ্‌খর সামান্য কয়েকদিন আগে এক তাতারকে হত্যা ক'রে পরহাল রাজ্য অধিকার ক'রে নেন। বাবর আরো এগিয়ে গিয়ে পরহাল দুর্গ অবরোধ করলেন। হাতি গখ্‌খর দুর্গ থেকে আপ্রাণ লড়েও শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন। বাধ্য হলেন বাবরের আধিপত্য মেনে নিতে।

বাবর এবার কাবুল ফেরার জন্য সিন্ধু নদ পার হতে উদ্যোগী হলেন। পথে কুরলুক হজারাদের নায়ক সংগর কুরলুক তার সাথে দেখা করলেন। সংগরের সাথে ছিলেন মীর্জা নরভি কুরলুক ও তাদের উপজাতির আরো তিরিশ থেকে চল্লিশ জন প্রধান। প্রত্যেকেই তার আধিপত্য স্বীকার ক'রে নিলেন।

২১শে মার্চ বাবর নীল-আব নদী পার হলেন। ২৪শে মার্চ কতক জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্য সেই নদীকূলে থামলেন তিনি। এখানে নীল-আবের অধিবাসীরাও তার অধীনতা স্বীকার ক'রে নিল। শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বাবর ভীর ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী বিজিত অঞ্চলের শাসনভার মহম্মদ আলী জুঙজাঙের উপর দিলেন। যারা ইতিমধ্যে বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিয়েছে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হলো। ৩০শে মার্চ কাবুল ফিরে এলেন বাবর।

কিন্তু তিনি ফিরে আসার ২৫ দিনের মধ্যেই ভীর অঞ্চলের পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিল। বাবর যতদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ততদিন তার অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সংযত হয়ে ছিল। কিন্তু তিনি সরে আসার সাথেই সাথে তারা বিদ্রোহ শুরু করলো। তাদের দমন বা আত্মরক্ষা ক'রে চলা অসাধ্য দেখে হিন্দু বেগ খুশ-আব সরে এলেন ও সেখান থেকে দীনকোট ও নীল-আব হয়ে কাবুল ফিরলেন। ভীর হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বাবরের কাছে দুঃসহ হলেও, তিনি অসুস্থ। সুতরাং ভীর পুনরুদ্ধারের জন্য সাথে সাথে কোন পদক্ষেপ নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

২৩শে মে মালিক মনসুর ইউসুফজাই সাওয়াদ থেকে ৬১৭ জন ইউসুফজাই প্রধানকে নিয়ে কাবুল উপস্থিত হলেন ও বাবরের অধীনতা স্বীকার ক'রে নিলেন আবার। এ ঘটনা থেকে সূচিত হয় যে হিন্দু বেগ যখন ভির-এ কতক হিন্দু ও আফগান উপজাতির বিদ্রোহের মুখোমুখি হন তখন তিনি ইউসুফজাইদের সমর্থণ সংগ্রহের চেষ্টা করেননি। এমনকি মহমুদ আলী জুঙজাঙের সাহায্য নেয়ার চেষ্টাও করেননি তিনি। ইউসুফজাইরা ঐ সময়ে বাবরের অধীনতা অস্বীকারের কোন উদ্যম করেনি। একথা বিবেচনা ক'রে বাবর ৩১শে মে ইউসুফজাই প্রধানদের পোষাক উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন। তাদের সাথে বাবরের এক চুক্তিও সম্পাদিত হলো। স্থির হলো যে তারা বছরের ছয় হাজার গাধা বোঝাই চাল কর হিসাবে দেবেন বাজৌর ও সাওয়াদের আফগান কৃষকদের পক্ষ থেকে।

২৭শে জুলাই বাবর আবদুর রহমান আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযানে বার হলেন। এরা কাবুল ও বাজৌরের মধ্যবর্তী সড়কে যাত্রীদের লুটপাট ক'রে চলছিল। গীরদীজ-এর সীমানা অঞ্চলে বসবাস এদের। আক্রমণ ক'রে এদের

প্রায় পঞ্চাশ জনকে কেটে ফেলা হলো। মুণ্ডগুলি একত্র ক'রে তা দিয়ে গড়া হলো বিজয়স্তম্ভ। ৩১শে জুলাই কাবুল ফিরে এলেন বাবর।

৮ই সেপটেমবর ইউসুফজাইদের বিরুদ্ধে অভিযানে বার হলেন তিনি। সুলতানপুর পৌঁছে দিলজাক আফগানদের কাছে খবর পেলেন যে যাযাবর উপজাতির লোকেরা প্রচুর শস্য নিয়ে বিপুল সংখ্যায় হস-নগরে সমবেত হয়েছে। তাদের আক্রমণ ক'রে হস-নগর কিংবা পেশোয়ার দখল ক'রে সেখানে মূল শিবির ক'রে সাওয়াদের ইউসুফজাইদের বিরুদ্ধে অভিযান করার পরামর্শ দিলে তারা। এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন বাবর। ২৭শে সেপটেমবর খাইবার গিরিপথের গোড়ায় এসে পৌঁছলেন। এখান থেকে বাজৌরে খাজা কলানের কাছে নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে খবর পাঠালেন। খাইবারের সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম ক'রে এলেন আলী মসজিদে। ভারি তল্পিতল্পা সেখানে রেখে, কাবুল নদী পার হলেন। খবর পেলেন, তার এগিয়ে আসার খবর পেয়ে ইউসুফজাইরা পালিয়ে গেছে। তবু না থেমে এগিয়ে চললেন বাবর। কাবুল ও স্বাত (সাওয়াদ) নদী পার হয়ে আফগানদের শস্যক্ষেত্র এলাকায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু হতাশ হলেন তিনি। দিলজাকরা যে পরিমাণ শস্যের কথা বলেছিলেন তার এক-চতুর্থাংশও নেই। অগত্যা ফিরলেন তিনি। হস-নগরকে মূল শিবির করার পরিকল্পনা ত্যাগ ক'রে জাম নদী পার হয়ে আলী মসজিদ নদীর কাছে হাজির হলেন। কিন্তু পেশোয়ার দখল করবার কোন রকম উদ্যম করার আগেই খবর পেলেন বদকশানে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। সুতরাং পরিকল্পনা স্থগিত রেখে ২রা অকটোবর কাবুল ফেরার জন্য রওনা হলেন তিনি। পথে খিজির খইল আফগানদের দমন করা হলো। বহু আফগান বন্দী হলো স্ত্রী পুত্র সহ। পরদিন ৫ই অকটোবর কীলাঘ-তে এসে আস্থান নিলেন তিনি: এখানে ওয়জীরী আফগানরা তার বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিয়ে বকেয়া কর হিসাবে ৩০০ ভেড়া দিলে তাকে। এরপর খিরিলচী ও শিমু খইল আফগানদের প্রধানরা বহু লোক সঙ্গে নিয়ে তার সাথে দেখা ক'রে তার আনুগত্য মেনে নিলো। দিলজাক আফগানরা তাদের হয়ে তার সাথে মধ্যস্থতা করলো। ফলে তাদের ক্ষমা প্রদর্শন ক'রে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দেয়া হলো। পরিবর্তে তাদের বলা হলো কর হিসাবে চার হাজার ভেড়া দিতে। তা আদায়ের জন্য কর্মচারীও নিযুক্ত করা হলো। ১৭ই নভেম্বর কাবুল ফিরে এলেন বাবর।

২৪শে নভেম্বর কন্দহার থেকে তাজুদ্দীন মাহমুদ এসে তার সাথে দেখা করলো। এ থেকে মনে করা যেতে পারে, এ সময়ে অরঘুনদের সাথে তার সুসম্পর্ক

চলছিল। ১২ই ডিসেম্বর এল নীল-আব থেকে মহম্মদ আলী জুঙজাঙ। পরদিন ভীর থেকে সংগুর খান জনজুহা এসে দেখা করলো। সুতরাং ভীর পর্যন্ত সমগ্র বিজিত অঞ্চল তার হাতের মুঠোয় আছে জেনে বাবর নিশ্চিত বোধ করলেন নিশ্চয়ই। হালকা মন নিয়ে এবার তিনি কাব্যচর্চার দিকে মন দিলেন আংশিক ভাবে। ১৬ই ডিসেম্বরের স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন: 'আলী শের বেগের চার দিওয়ান-এর গীত ও পদগুলিকে মাত্রানুসারে সাজিয়ে প্রতিলিপি রচনা শেষ করলাম।' ২০শে ডিসেম্বর তিনি এক সামাজিক আসরের আয়োজন করেন। এতে আদেশ জারী করা হয়, যদি কাউকে এ আসর থেকে মাতাল হয়ে বার হতে দেখা যায় তবে আর কখনো তাকে আসরে নিমন্ত্রণ করা হবে না। এরূপ কাব্য চর্চা বা আনন্দ উৎসবের মধ্যেও বাবর কিন্তু রাজকার্যের প্রতি আদপেই উদাসীন থাকলেন না। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চললেন তিনি: তার নজর তখন যতো সম্ভব সম্পদ সংগ্রহের দিকে। তা না হলে হিন্দুস্তানের সুলতান ইব্রাহীম লোদীর সাথে অস্ত্রের পাল্লায় কী ক'রে মুখোমুখি হবেন তিনি?

ডিসেম্বর মাসে তিনি প্রমোদ ভ্রমণে বার হলেন কোহদমন, কোহিস্তান ও লমঘান যাবার লক্ষ্য নিয়ে। বলার মতো কোন ঘটনাই ঘটলো না। খাজা শিয়ারান, দর-নমা হয়ে নিজর-আউ এলেন। এখানে এসে ঠিক করলেন লমঘান যাবেন। বাজৌরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি। এ রাজ্য তারই কর্মচারীদের দ্বারা শাসিত তখন। শাসনকর্তা লঙ্গর খান নিয়াজাই তাকে সম্বর্ধনা জানালেন বাগ-ই-ওয়াফায়। কয়েকদিন সেখানে থেকে ভীর অভিযান করলেন তিনি বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য। বিদ্রোহীরা ইতিপূর্বে তার প্রতিভূ হিন্দু বেগকে এখান থেকে বিতাড়িত করেছিল। ভীর আক্রমণ করলেন তিনি। অসংখ্য আফগান মারা পড়লো, অনেকে বন্দী হলো। কৃষকরা এতে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। তারা এদের হাতে নিপীড়িত হয়ে চলছিল।

এরপর শিয়ালকোটের দিকে এগিয়ে চললেন বাবর। সেখানকার অধিবাসীরা তার বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিল। শিয়ালকোট অধিকারে সফল হয়ে এবার তিনি গেলেন সৈয়দপুর। এখানকার অধিবাসীরা অনমনীয় মনোভাব নিয়ে দুর্জয়ভাবে প্রতিরোধ ক'রে চললো। তখন তিনি উদ্দাম আক্রমণ চালালেন। দুর্গ বিধ্বস্ত ক'রে সমগ্র সেনাবাহিনীকে নিঃশেষ করলেন। লাহোর অধিকার করার বাসনা নিয়েই এ অভিযানে বার হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না।

ইতিমধ্যে খবর এল শাহ বেগ অরঘুন তার রাজ্য আক্রমণ করেছে। অভিযান অসমাপ্ত রেখে রাজ্য রক্ষার জন্য কাবুল ছুটলেন সাথে সাথে।

শাহ বেগ অরঘুনের এই খোলাখুলি শত্রুতা বাবরকে সচেতন ক'রে তুললো। তিনি উপলব্ধি করলেন যতদিন কন্দহার অবিজিত থাকবে ততদিন তার রাজ্যের নিরাপত্তা এবং হিন্দুস্তানে সাম্রাজ্য গড়ার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তা বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে। একে অবিলম্বে জয় ক'রে নেয়া প্রয়োজন। কাবুল ফিরে এসে তিনি অরঘুনদের তার রাজ্য সীমানা থেকে হটে গিয়ে কন্দহার দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হবার জন্য বাবর তাদের পিছু তাড়া ক'রে কন্দহার পর্যন্ত ছুটে গেলেন। অবরোধ করলেন দুর্গ। কিন্তু দেখা গেল এ দুর্গ জয় করা সহজসাধ্য নয়। অতএব অবরোধ ক'রে চলা মূর্খতা বুঝে এক বা দু মাস পরে সৈন্য নিয়ে ফিরে চলে এলেন। ঠিক করলেন, কন্দহারকে দুর্বল ক'রে তার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্য এবার থেকে তাকে নিয়মিত আক্রমণ ও লুটতরাজ ক'রে চলবেন।

১৫২০ অব্দে বদকশানের সুলতান মীর্জা খানের মৃত্যু হলো। ছেলে সুলেইমান নাবালক। আমীররা একতাবদ্ধ নয়। যে কোন মুহূর্তে উজবেগরা দেশ আক্রমণ ক'রে বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। এ পরিস্থিতিতে একজন নাবালক কী ক'রে রাজ্য চালাবে? সুতরাং সুলেইমানকে নিয়ে তার মা সুলতান নিগার খানুম কাবুল চলে এলেন। তাদের বাবরের কাছে আশ্রয় নিতে দেখে বদকশানের আমীরাও বাবরকে অনুরোধ জানালেন রাজ্যশাসন চালাবার জন্য পরিবর্ত কোন ব্যবস্থা করার জন্য। বাবর তদনুসারে তার বড় ছেলে হুমায়ুনকে শাসনভার দিয়ে সেখানে পাঠালেন। মা মাহীমকে নিয়ে হুমায়ুন বাবরের নির্দেশে সেখানে চলে গেলেন।

এদিকে বাবর পূর্ব পরিকল্পনা মতো আবার কন্দহার অভিযান করলেন। অবরোধ করলেন কন্দহার শহর ও দুর্গ। স্থানীয় সৈন্যরা প্রবল বাধা দিয়ে চললেও শেষ পর্যন্ত বেশ দুর্দশার মুখোমুখি হলেন। খাদ্যাভাব ও সংক্রামক রোগের ফলে আক্রান্ত ও আক্রমণকারী দুই পক্ষই চরম দুর্দশায় পড়লেন। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন দুজনেই। অবরোধ তুলে নিয়ে জুন মাসে কাবুল ফিরে এলেন বাবর।

১৫২০ অব্দের শেষ ভাগে বাবর সস্ত্রীক হুমায়ুনের সাথে দেখা করার জন্য বদকশান গেলেন। ফিরে এসে পরের বছর আবার কন্দহার অভিযান করলেন। ধ্বংস ও লুটতরাজ করতে করতে এগিয়ে গেলেন তিনি। তার কার্যকলাপ

কন্দহারের সাধারণ মানুষকে গভীর দুর্দশা ও অন্নকষ্টের মধ্যে ঠেলে দিল। ধ্বংস, লুঠতরাজ ও বর্বর আচরণকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করলেও এবং এজন্য মুঘলদের দীর্ঘকাল ধরে বাধা ও কঠোর সমালোচনা ক'রে এলেও, কাবুল বিজয়ের পর থেকে একে যে তিনি তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সীমিত ভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলেন আফগান উপজাতিদের প্রসঙ্গে তা আমরা দেখেছি। এবার কন্দহারের বেলা তা আমরা আবার দেখলাম। তবে যে-সব অঞ্চল একদা তৈমুরলঙের সাম্রাজ্যের অধীন ছিল ইতিপূর্বে, সে সব অঞ্চলে সর্বদাই তিনি নীতি হিসাবে লুটতরাজকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। এক্ষেত্রে কন্দহার এক বিশেষ ব্যতিক্রম। যাই হোক, এভাবে কন্দহার দুর্গের গোড়ায় পৌছে দুর্গ অবরোধ করলেন তিনি। সেখানকার সেনাবাহিনীর উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন। শাহ বেগ অরঘুন আক্রান্ত হয়ে পারস্যের শাহ ইসমাইল সফবীর সাহায্যপ্রার্থী হলেন। কারণ জানা না গেলেও এ সময়ে পারস্যের শাহর সাথে বাবরের সুসম্পর্ক ছিল না। সম্ভবতঃ বাবরের অদম্য সাহস ও সংগঠন শক্তি এবং তার সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্নের সাথে তিনি সুপরিচিত ছিলেন বলেই তার ক্রমবর্ধমান শক্তি ও কন্দহার অধিকার প্রচেষ্টাকে তিনি সুনজরে দেখতে পারছিলেন না। তবে এ সময়ে তিনি তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে বিশেষ ভাবে বিব্রত ছিলেন বলে অরঘুনদের কোন রকম সাহায্য করার পরিস্থিতিতে ছিলেন না। সুতরাং অরঘুনদের বিব্রত না করার জন্য তিনি বাবরকে এক অনুরোধ পত্র পাঠালেন। বাবরও অন্যান্যবারের মতো খুব সুচতুর ভাষায় পত্র দিয়ে তাকে জানালেন ঃ অরঘুন শাসকেরা পারস্যের শাহের প্রতি আনুগত্যের ভাব দেখালেও তারা আসলে শাহের শত্রুতাচারণ ক'রে চলেছে। তিনি এই কপট আচরণকারীদের শায়েস্তা ক'রে শাহের পদপ্রান্তে পাঠাবেন। এ পত্র শাহের কাছে পৌছবার পর হীরাটের আমীররা শাহকে বাবরের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য অনুপ্রাণিত করার অনেক চেষ্টা করলেও পরিস্থিতির চাপে তাতে তিনি রাজী হলেন না। তবে, যে কারণেই হোক বাবরও অবরোধ তুলে নিয়ে কন্দহার থেকে ফিরে এলেন। হয়তো শাহকে চটানো অদূরদর্শী কাজ হবে মনে করেই তিনি এমনটি করলেন।

তাই বলে সংকল্পচ্যুত হলেন না বাবর। পরের বছর (১৫২২ অব্দ) আবার তিনি যথারীতি কন্দহার অভিযানে বার হলেন। বার হবার কয়েকদিন পূর্বে তিনি পারস্যের রাজকুমার তাহমস্পের এক কর্মচারী দুরমেশ খানের কাছ থেকে এক পত্র পেলেন। এ থেকে তিনি জানতে পেলেন যে রাজকুমার কন্দহার জয়ের

জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বাবরও এজন্য চেষ্টা করবে ভেবে তিনি শেষ পর্যন্ত তার এরূপ অভিযান থেকে নিরস্ত থাকলেন। এ চিঠি বাবরকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল। সবদিক বিবেচনা ক'রে তিনি কন্দহার থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। সুরু করলেন পশ্চাত-অপসরণ। এদিকে শাহ বেগ অরঘুনও বাবরের হাত থেকে কন্দহার বাঁচানো অসম্ভব মনে ক'রে মৌলানা আবদুল বাকীর উপর শহর রক্ষার ভার দিয়ে সিন্ধু চলে গেলেন। সে বছরের জুলাই মাসেই মারা গেলেন তিনি। এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে মৌলানা আবদুল বাকী এক বিশেষ দূত মাধ্যমে বাবরের কাছে শহর ও দুর্গ সমর্পণের প্রস্তাব পাঠালেন। বাবর দ্বিধা না ক'রে সাথে সাথে কন্দহার ছুটে গেলেন (৬ সেপ্টেম্বর ১৫২২)। এভাবে শেষ পর্যন্ত বিনা যুদ্ধেই কন্দহার তার হাতের মুঠোয় চলে এলো। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় ছেলে মীর্জা কামরানের উপর তার শাসনভার অর্পণ করলেন তিনি। কামরান হুমায়ুনের চেয়ে মাত্র কয়েক মাসের ছোট।

এ ঘটনার পর বাবর তার কন্দহার বিজয়-সাফল্যের খবর দিয়ে পারস্যের শাহের কাছে দূত পাঠালেন। পারসিকরা বরাবর কন্দহারের উপর তাদের আইনসঙ্গত দাবীর কথা শুনিয়ে এলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে ঘটনাকে হজম ক'রে নিতে বাধ্য হলেন। তাদের নির্বিকার মনোভাব বাবরকে আরো উৎসাহিত ক'রে তুললো। তিনি আর এক পা এগিয়ে হেলমুণ্ডের গরমশীর দুর্গও দখল ক'রে নিলেন। এভাবে পারসিক ও উজবেগ আক্রমণ ব্যর্থ করার পক্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দুটি দখল ক'রে বাবর তার রাজ্যের স্থিতি সুদৃঢ় ক'রে তুললেন। স্বস্তির সাথে এবার তিনি হিন্দুস্তানে তার স্বপ্নকে সফল ক'রে তোলার দিকে মন দিলেন।

হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এ সময় ক্রমশই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হয়ে চলছিল। দিল্লী মুসলমান অধিকারে যাবার পর থেকে প্রকৃত পক্ষে কোন সময়েই তার সিংহাসনকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের বিরাম ছিল না। আফগান লোদী আমলকেও তা সংক্রামক ব্যাধির মতো ঘিরে ধরেছিল। বহু উপজাতিতে বিভক্ত আফগানদের মধ্যে প্রথম থেকেই ঐক্যের একান্ত অভাব। প্রত্যেকেই উদগ্রীব ছিল নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য—আত্মস্বার্থ চরিতার্থের জন্য। এমনকি লোদী উপজাতির আফগানরাও ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না। ফলে নির্ভাবনায় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে রাজ্য পরিচালনা যুবক ইব্রাহিম লোদীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। নিজেকে কিছুটা দৃঢ় ভাবে

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথেই তাই তিনি মন দিলেন বয়স্ক আমীরদের সরিয়ে তার প্রতি অনুগত নবীনদের তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে। এভাবে রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে নিজের অনুকূলে আনতে। কিন্তু যেরূপ ধৈর্য ও চতুরতার সঙ্গে এ কাজটি করা প্রয়োজন তা তিনি ক'রে উঠতে পারলেন না। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশঃ ঘোরালো হয়ে চললো। অধিকাংশ আমীরই তার শত্রু হয়ে উঠলো। এছাড়া আপন কাকা আলম খান এবং পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী তো আছেনই।

বয়স্ক আমীরদের ক্ষমতাচ্যুত হতে দেখে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদীও আশংকায় দিন গুণে চলছিলেন। তার আশংকা সত্যে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে, ইতিমধ্যেই তিনি তার ছেলে দিলাওয়র খানকে কাবুলে বাবরের কাছে পাঠিয়েছিলেন তার সাহায্যে ইব্রাহীম লোদীকে বিতাড়িত করার জন্য (১৫২১-২২)।

প্রায় একই সময়ে আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। ইব্রাহীম লোদীর কাকা আলম খান ছিলেন গুজরাটে, সেখানকার সুলতান মুজাফ্ফরের কাছে। এক আমীর তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সুলতান আলাউদ্দীন নামকরণ সহ দিল্লীর সুলতান রূপে ঘোষণা ক'রে বসলেন। কিন্তু ইব্রাহীম লোদীকে সিংহাসন থেকে হটানো তার পক্ষে দুঃসাধ্য দেখে সুলতান আলাউদ্দীনও সাহায্যের জন্য বাবরের কাছে এলেন।

অল্প কিছুকালের মধ্যে মেবারের রাণা সঙ্গের (সংগ্রাম সিংহ) কাছ থেকেও একটি পত্র পেলেন বাবর। তিনিও যৌথ ভাবে দিল্লী আক্রমণ ক'রে লোদী-বংশের পতন ঘটিয়ে নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগি ক'রে নেবার প্রস্তাব পাঠালেন তার কাছে। ভাগ কিরূপ ভাবে হবে তারও এক স্পষ্ট প্রস্তাব দিলেন তিনি। আগ্রা পর্যন্ত সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ যাবে রাণা সংঘের দখলে এবং দিল্লী পর্যন্ত পশ্চিমাংশ বাবরের দখলে। হিন্দু রাজাদের মধ্যে এ সময়ে রাণা সঙ্গই ছিলেন সব থেকে শক্তিশালী। তিনি তখন রাজপুতদের প্রধান। স্থানীয় এক শক্তিশালী রাজার কাছ থেকে এরূপ এক প্রস্তাব নিঃসন্দেহে লোভনীয়।

বাবর তার চতুর্থ ভারত অভিযানের জন্য উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হলেন। ১৫২৪ অব্দে তিনি তার কতক আমীরের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠালেন শিয়ালকোট ও লাহোর অধিকারের উদ্দেশ্যে। সেই সাথে লোদী সাম্রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ ক'রে তার কাছে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন।

এর মধ্যে দৌলত খান লোদীর চক্রান্তের খবর জানতে পেলেন ইব্রাহীম লোদী। বাবর সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন এ সংবাদও পেলেন। দৌলত খান ও তার ছেলেদের দমন করার জন্য ও কোন বিদেশী শত্রুর অভিযান হলে তা প্রতিহত করার জন্য এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠালেন বিহার খান, মুবারক খান লোদী ও ভিকম খান নুহানীর অধীনে।

সুলতানের বাহিনী দৌলত খানকে লাহোর থেকে তাড়িয়ে শহর অধিকার ক'রে নিলেন। কিন্তু এ সাফল্য নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হলো। সুলতানের সেনানায়কেরা যখন পাঞ্জাবে বিদ্রোহীদের নিয়ে ব্যস্ত সেই অবকাশে বাবর সিন্ধু নদ পার হয়ে অতি আচমকা লাহোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরূপ অভাবিত আক্রমণের জন্য সুলতানের বাহিনী আদপেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিহার খান ও মুবারক খান দুর্গে ঠাঁই নিয়ে প্রতিরোধ ক'রে চলার পরিবর্তে অভিযানকারীদের আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড লড়াই ক'রেও শোচনীয় ভাবে হেরে গেলেন তারা। বাবর শহর মধ্যে প্রবেশ করলেন। ২২শে ও ২৬শে জানুয়ারী, দুদিন শহর পোড়ান হলো। তারপর এগিয়ে গেলেন দীপালপুর। তাকেও বিধ্বস্ত ক'রে দখলে আনলেন তিনি।

বিতাড়িত দৌলত খান এবার তার দুই ছেলে ঘাজী খান ও দিলাওয়র খানকে নিয়ে দীপালপুরে বাবরের সাথে মিলিত হলেন। বাবরের কাছ থেকে বিরাট কিছু প্রতিদান প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু বড়োই হতাশ হতে হলো তাকে। তিনি দেখলেন বাবর তার সাথে জোটের শরিকের মতো আচরণ না ক'রে প্রভুর মতো আচরণ করছেন। লাহোর নিজ অধিকারে রেখে বাবর শুধু মাত্র জালন্ধর ও সুলতানপুর দিলেন তাকে। দৌলত খান সাময়িক ভাবে পরিস্থিতিকে অসন্তুষ্ট মনে মেনে নিলেও এর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকলেন। বাবরকে আক্রমণ ক'রে পাঞ্জাব থেকে হটিয়ে দেবার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু তার ছেলে দিলাওয়র খান তা পছন্দ করলেন না। তিনি বাবরের প্রতি অনুগত থেকে এ ষড়যন্ত্রের খবর জানালেন তাকে। বাবর দৌলত খানকে আটক ক'রে নজরবন্দী রাখলেন। দিলাওয়র খানকে সুলতানপুরের শাসনভার দিলেন তিনি। সুলতান আলাউদ্দীন বা আলম খানের উপর দেয়া হলো দীপালপুরের ভার। কাবুল ফেরার আগে দৌলত খানকে মুক্তি দিলেন বাবর। তিনি গিয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় নিলেন।

বাবর কাবুল ফিরে যাবার পরে পাঞ্জাবের পরিস্থিতির অবনতি দেখা

দিল। দৌলত খান লোদী এবার স্বাধীনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন বাবরের সাথে জোটবদ্ধ থেকে তার স্বার্থসিদ্ধির আশা কম। সে পাঞ্জাবকে নিজের দখলে রাখতে চায়। আপন ছেলে দিলাওয়র খানকে পরাস্ত ক'রে দৌলত খান সুলতানপুর-দখল ক'রে নিলেন। সুলতান ইব্রাহীম লোদী পাঞ্জাব পুনরুদ্ধারের জন্য যে সৈন্যদলকে পাঠালেন তাকেও পরাজিত করলেন। তারপর আলম খান লোদীর বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে তাকেও হটালেন দীপালপুর থেকে। আলম খান আবার বাবরের কাছে কাবুল পালিয়ে গেলেন।

দিল্লীর তখতে বসার স্বপ্ন তখনও ত্যাগ করেননি আলম খান। কাবুল গিয়ে তিনি বাবরের কাছে পাঞ্জাবের পরিস্থিতি জানাবার সাথে সাথে তার কাছে প্রস্তাব রাখলেন, যদি বাবর তাকে দিল্লীর তখতে বসতে সাহায্য করেন তবে তিনি লাহোর পর্যন্ত হিন্দুস্তানের পশ্চিমাংশ তাকে ছেড়ে দেবেন। পারস্যের শাহকে বালখ থেকে উজবেগদের তাড়িয়ে দেবার কাজে সাহায্য করার জন্য বাবরকে এ সময়ে বালখ যেতে হলো। তিনি তাই তার পাঞ্জাবস্থ কর্মচারীদের কাছে একটি ফরমান সহ আলম খানকে পাঞ্জাব পাঠালেন। দিল্লী বিজয়ে আলম খানকে সাহায্য করার জন্য এ ফরমানে কর্মচারীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্মচারীরা সেই নির্দেশ মতো তাকে সাহায্য করতে অনিচ্ছা দেখাল। কেননা, তারা তাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে চলছিল। তখন আলম খান ঘাজী খানের ছেলে শের খানকে তার পিতা ও দৌলত খানের কাছে পাঠিয়ে, বাবরের বাহিনীর বিরুদ্ধে জোট বাঁধার চেষ্টায় মাতলেন। ঘাজী খানও আলম খানকে বাবরের শিবির থেকে সরিয়ে আনার জন্য তার সাথে জোট বাঁধতে রাজী হয়ে গেলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন বিদেশী সাহায্য ছাড়াই তাকে দিল্লীর তখতে বসাবেন।

আলম খান বাবরের দলত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় আফগানরা খুশী হলেন। এমনকি দিলাওয়র খানও তার সাথে যোগ দিলেন এবং অন্যদের দলে টানলেন। সকলে এবার ঘাজী খানের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হলেন। প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে দিল্লী অবরোধ করা হলো। কিন্তু ইব্রাহীম লোদীর কাছে পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত দোয়াব অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন আলম খান। তারপর সেখান থেকে পানিপথ। শতদ্রু পার হয়ে আশ্রয় নিলেন কিনকুল দুর্গে। কিন্তু বাবরের হজারা ও আফগান বাহিনী দুর্গ ঘিরে ফেলে গভীর রাতের অন্ধকারে তাকে পালিয়ে

যেতে বাধ্য করলে। ঘাজী খানের কাছে উপস্থিত হলে তিনি এবার আর তাকে আমল দিলেন না। তখন তিনি পেহলুরে বাবরের সাথেই আবার যোগ দিলেন।

তবে এতেদৌলত খান ও ঘাজী খান অথবা আলম খান কারোই কোন সুবিধা হলো না। ইব্রাহীম লোদীর কাছে জোর মার খেলেন তারা। হতাশায় ভেঙে পড়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার তারা সকলে বাবরের দ্বারস্থ হলেন। ১৫২৪-এর অভিযান ও তার পরবর্তী ঘটনাধারা থেকে বাবর বুঝতে পেরেছিলেন যে পাঞ্জাবে তার হৃতগৌরব উদ্ধার করতে হলে আরো তীব্র ও সংঘবদ্ধ সমর অভিযান প্রয়োজন।

এরূপ অভিযানের আয়োজন করা বাবরের পক্ষে খুব সহজ কাজ ছিল না। এজন্য প্রচুর অর্থ, যথেষ্ট প্রস্তুতি ও সতর্ক পরিকল্পনার প্রয়োজন। দৌলত খান এবং আলম খানের মতো লোকের উপর নির্ভর করাও কোন কাজের কথা নয়। তাছাড়া অন্যের পায়ে হাঁটার অভ্যাস তিনি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ত্যাগ করেছেন। তিনি জেনে গেছেন তাতে অন্যেরাই তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে। আবার, কোন বিষয়ে একবার সংকল্পবদ্ধ হলে তা থেকে পিছু হটতে বাবর শেখেননি। হিন্দুস্থানে সাম্রাজ্য গড়ার জন্য তিনি এখন একাগ্র। অতএব যথাসম্ভব প্রস্তুত হয়ে ১৫২৫ অব্দের শেষে ১৫ই সেপটেমবর কাবুল থেকে রওনা হলেন তিনি। বড় ছেলে হুমায়ুনকেও খবর দিলেন বদকশান থেকে তার সেনাবাহিনী নিয়ে অবিলম্বে তার সাথে যোগ দিতে। দেহ-আকাতে হুমায়ুন ও খাজা কলান বাবরের সাথে যোগ দিলেন। ১৬ই ডিসেমবর সিন্ধু নদ পার হলেন। নীল-আব নদী তীরে পৌঁছে ছাউনি ফেললেন তিনি। বক্সীদের আদেশ দিলেন সৈন্য সংখ্যা কতো তা গুণে জানাতে। তারা গুণে জানালেন, সংখ্যায় সৈন্যরা মোট বারো হাজার।

নীল-আব নদীতীরে থাকাকালে বাবর খবর পেলেন ঘাজী খান ও দৌলত খান তাদের কথার খেলাপ করেছেন। তারা ৩০ থেকে ৪০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছে ও বিরুদ্ধ কার্যকলাপ করার পরিকল্পনায় রয়েছে। তারা কলনউর দখল ক'রে এগিয়ে চলেছে লাহোর, সুলতান ইব্রাহীম লোদীর আমীর ও অনুগামীদের আক্রমণ করার জন্য। বাবর পাঞ্জাবে থাকা তার আমীরদের কাছে তার আগমন সংবাদ পাঠিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললেন। নীল আব পার হয়ে এলেন কছকোট। তারপর হরুর নদীতীরে বলনাথ যোগী হয়ে ঝিলম নদী পার হয়ে ভেট-এ।

এখানে এসে খবর পেলেন শিয়ালকোট দুর্গের রক্ষক খুসরাউ কুকুলদাস ঘাজী খান সসৈন্যে এগিয়ে আসছে শুনে দুর্গ ত্যাগ ক'রে চলে এসেছে। ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তবু এগিয়ে চললেন বাবর। খবর এলো ঘাজী খান ও দৌলত খান পথরোধ ক'রে তাকে প্রতিহত করার জন্য ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে। বাবর ফরমান জারী ক'রে তার আমীরদের জানিয়ে দিলেন, তিনি না পৌছান পর্যন্ত তারা যেন আফগান বিদ্রোহীদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেন। দ্রুত চলে চন্দ্রভাগা নদী-তীরে পৌছে সেখানে ছাউনি ফেললেন তিনি। ২৯শে ডিসেমবর আবার যাত্রা শুরু ক'রে শিয়ালকোটের দিকে বাঁক নিলেন। অধিকার করলেন শিয়ালকোট দুর্গ। সেখান থেকে নুর বেগের ভাই শাহমকে পাঠালেন লাহোর থেকে ঘাজী খানের গতিবিধি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে, যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক স্থান নির্ণয় করতে। পশরুর এসে খবর পেলেন তার এগিয়ে আসার খবর পেয়ে ঘাজী খান পিছু হটতে শুরু করেছেন। উৎসাহিত হয়ে আরো দ্রুত লাহোর এগিয়ে চললেন তিনি। আমীর মুহম্মদ কুকুলদাস, আমীর কুতলুঘ-কদম, আহমদী পরওয়ানচী, আমীর ওয়লী খাজিন প্রভৃতিকে বিরাট বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের পিছু তাড়া ক'রে মিলওয়াট (মলোট) দুর্গ অবরোধ করার নির্দেশ দিলেন। পরদিন বাবর নিজে সেখানে পৌঁছে দুর্গের বাইরে ছাউনি ফেললেন।

কিন্তু ঘাজী খান সে দুর্গে ছিলেন না। ছিলেন শুধু দৌলত খান ও আলী খান। বাবর আলী খানকে নিজের পক্ষে টানলেন এবং গৃহ-শত্রু রূপে কাজ করার জন্য দুর্গের ভেতরে পাঠালেন। অল্পকাল মধ্যেই দৌলত খানের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠলো। নিরাপদে জীবন নিয়ে চলে যেতে দেবার সর্তে বাবরের কাছে দুর্গ সমর্পণ করলেন তিনি (৭ই জানুয়ারী ১৫২৬)। তার বিষয় সম্পত্তি তালিকা ক'রে সৈন্যদের মধ্যে বেঁটে দেবার আদেশ দিলেন বাবর। আলী খান ও পরিবারের অন্যান্যদের সহ দৌলত খানকে নিরাপদে মীর খলীফার বাড়ি পৌঁছে দেয়া হলো। সেখানেই রইলেন তারা।

বর্তমান বাবর আর আগের বাবর নন, যার কাছে বাস্তবের চেয়ে আদর্শ বড়ো ; যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে শত্রুকে নিরাপদে ফিরতে দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন। তাই পরদিন দুর্গের প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রে তিনি ঘাজী খানের খোঁজে অনুসন্ধান বাহিনী পাঠালেন। দৌলত খান, আলী খান ও ইসমাইল খানকে ভীর-এ নিয়ে গিয়ে সেখানকার দুর্গে বন্দী ক'রে রাখার

হুকুম দিলেন। সেই মতো ভীর নিয়ে যাবার পথেই মারা গেলেন দৌলত খান

ঘাজী খানের সন্ধান চালিয়েও তাকে ধরতে পারলেন না বাবর। তিনি দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাহিনী নিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে শিরহিন্দের সীমানায় এসে পৌঁছলেন বাবর। ঘর্ঘরা নদী-তীরে ছাউনি ফেললেন। এখানে তিনি অরইশ খান ও মৌলানা মুহম্মদ মজহবের কাছ থেকে পত্র পেলেন। এরা দুজনেই ইব্রাহীম লোদীর সেনানায়ক। তারা বাবরকে এগিয়ে আসার জন্য প্রেরণাবাণী পাঠিয়ে জানিয়েছেন, তারা সদলে তার সাথে যত তাড়াতাড়ি পারেন যোগ দেবেন। এ পত্র বাবরকে উৎসাহিত করলো। তিনি বন্ধুত্বের আশ্বাস দিয়ে দূত মাধ্যমে তাদের কাছে পত্র পাঠালেন।

আরো দু যোজন এগিয়ে রূপার হয়ে শিরহিন্দ এলেন বাবর। তারপর বনুর ও সনুর নদী পার হলেন। এ পর্যন্ত কোথাও কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি হননি তিনি। তার অগুয়া বাহিনীর কাজেও তিনি খুসী। তারা সারা পথ তাকে প্রয়োজনীয় খবর যুগিয়ে চলেছে সাফল্যের সাথে। যুগিয়ে চলেছে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ। বনুর নদীতীরে পৌছে তিনি গুপ্তচরের মুখে খবর পেলেন ইব্রাহীম লোদী তাকে বাধা দেবার জন্য দিল্লী থেকে এগিয়ে আসছেন। যে রণক্ষেত্রে তিনি কিছুদিন আগে আলম খান লোদীকে পরাজিত করেছেন সেখানেই বর্তমানে ছাউনি ফেলেছেন। ইব্রাহীম লোদীর বাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত খবর সংগ্রহের জন্য এবার কিট্টা বেগকে পাঠানো হলো। মোমিন আটকাকে পাঠানো হলো ইব্রাহীম লোদীর খাস খইল বাহিনীর খবর নিতে। এই বাহিনীকে হমিদ খান খাস খইলের নেতৃত্বে তাকে বাধা দেবার জন্য হিসার-ফীরুজে জমায়েত করা চলছিল।

বাবর আরো এগিয়ে অম্বালায় ছাউনি ফেললেন। তার সামনে এবার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বিজিত অঞ্চলে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও ইব্রাহীম লোদীর সাথে যুদ্ধ করা। উভয় কাজ যথাযথ ভাবে ক'রে চলার জন্য তিনি কাবুল থেকে আলা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি বসালেন। এজন্য যে অঞ্চলগুলিকে বেছে নিলেন তিনি তা হলো বদাম-চশমা, আলী মসজিদ, পেশোয়ার, শিয়ালকোট, পশরুর, কলনউর, মহলোট, বহলোলপুর ও রূপার। এ ব্যবস্থা সূচনা ক'রে বাবর এখন শুধু দুঃসাহসী নন, দূরদর্শীও। আগের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন ও সমরকুশলী। সম্পূর্ণ এক অজানা,

অচেনা অঞ্চলে এগিয়ে চলেছেন তিনি, যে-কোন বিপদে পড়তে পারেন, যে-কোন মুহূর্তে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে আগুয়া বাহিনীর কাছ থেকে। এ ক্ষেত্রে কাবুলের সাথে যোগাযোগ রেখে চলা তার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

তিনি তখনো অম্বালায়। চর খবর আনলো হমিদ খান তার বাহিনী নিয়ে হিসার-ফিরুজ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। তাকে বাধা দেবার জন্য হুমায়ুনকে পাঠালেন তিনি। এই বাহিনী যাতে দিল্লী হতে এগিয়ে আসা বাহিনী থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে সেজন্যও ব্যবস্থা নিতে আদেশ দেয়া হলো হুমায়ুনকে। হমিদ খান নিজেকে কাপুরুষ বলে প্রমাণ করলেন এ যুদ্ধে। কোন রকম প্রতিরোধ চেষ্টা না করেই তিনি ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। ফলে হিসার-ফিরুজ ও জালন্ধর বাবরের অধিকারে এলো। এর ফলে বাবরের পাঞ্জাব বিজয় একরকম সম্পূর্ণ হলো বলা যেতে পারে। সামরিক দিক থেকেও এর ফলে তিনি যথেষ্ট সুবিধাজনক পরিস্থিতি লাভ করলেন। সেনাবাহিনীর মনোবলও যথেষ্ট বেড়ে গেল। উৎসাহ ও উদ্দীপনা খেলে গেল তাদের মধ্যে।

তবু অতি সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন বাবর। যতোই হোক সম্পূর্ণ অজানা অচেনা দেশে অজানা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলেছেন তিনি। চারদিকে খবর সংগ্রহের জন্য নিপুণভাবে গুপ্তচরের জাল ছড়িয়ে দিলেন। অম্বালা থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণে এগিয়ে এলেন শাহাবাদ। এখানে দিন কয়েক কাটিয়ে পার হলেন যমুনা নদী, পৌছলেন সরসোয়া। সংবাদ এলো, পাঁচ-ছয় হাজার সেনা নিয়ে দাউদ খান ও হাতিম খান ইব্রাহীম লোদীর নির্দেশে যমুনা পার হবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছে ও বাবরের বাহিনী থেকে বর্তমানে তারা ছ-সাত মাইল দূরে রয়েছে। সাথে সাথে তাদের আক্রমণ করার জন্য সেনাদল পাঠানো হলো। প্রকৃত পক্ষে ইব্রাহীম লোদীর বাহিনীর সাথে এই প্রথম বাবরের বাহিনীর সংঘর্ষ হলো। এ লড়াইয়ে হাতিম খান হেরে গিয়ে প্রাণ খোয়ালেন। সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ দিয়ে প্রাণভয়ে যেদিকে পারলো ছুট দিল। এই পিটুনি ইব্রাহীম লোদীর সেনাবাহিনীর মনোবল যে বেশ দমিয়ে দিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অন্য দিকে বাবর ও তার বাহিনী আরো উদ্দীপিত হবার কথা।

সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় ব্যূহ রচনা ক'রে এবার এগিয়ে চললেন বাবর। আদেশ দিলেন যেখানে যতো শকট মেলে সংগ্রহ ক'রে আনার জন্য। ৭০০ গাড়ি জোগাড় হলো। সেগুলিকে বাঁধা হলো চামড়ার রশি দিয়ে। প্রতি

জোড়া গাড়ির মাঝে বর্ম আঁটা হলো।, তার আড়ালে পলতে বন্দুকধারী-দের আদেশ মাত্র গুলীবর্ষণের আদেশ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো।

এগিয়ে চলে ১৫২৬ অব্দের ১২ই এপ্রিল বাবর দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম দিকের একটি ছোট গ্রাম পানিপথে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা স্থির করার জন্য এখানে এক পরামর্শ সভা ডাকলেন তিনি। অনেক আলোচনার পর, ভূ-প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিক বিচার বিবেচনা ক'রে সৈন্য-সমাবেশের স্থান নির্বাচন করা হলো। বাবর নিজে সতর্ক ভাবে স্থান পরিদর্শন ক'রে কোন্ শাখা-বাহিনী কোথায় স্থান নেবে তা নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন। সুদৃঢ় প্রতি-রোধ ব্যূহ রচনার জন্য তিনি ডাইনে থাকা পানিপথ শহর বেছে নিলেন। বাঁয়ে পরিখার পর পরিখা কেটে ডালপালা দিয়ে তা ঢেকে দিয়ে ফাঁদ তৈরী করা হলো। মাঝে রাখা হলো ৭০০ গাড়িকে। প্রতি জোড়া গাড়ির মাঝে ঝোলানো হলো ৫।৬ টি ক'রে মেয়েদের ছোট ঢিলে জামা। সারিবদ্ধ গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর একশো থেকে দুশো অশ্বারোহীর যাতায়াতের মতো পথ রাখা হলো। বর্ম ও জামার আড়াল করা গাড়ির পিছনে পলতে বন্দুকধারীরা স্থান নিলো। অশ্বারোহীরা রইলো তাদের পার্শ্বরক্ষক হিসেবে। সেনা সমাবেশের বেলা বাবর বিশেষভাবে নজর রাখলেন যাতে তার বাঁ ও ডানের শাখা বাহিনী পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকে. সম্মুখ বাহিনী যাতে জামার আড়াল থেকে স্বচ্ছন্দে শত্রু সেনার উপর তীর ছুঁড়তে পারে। পরিকল্পনা নেয়া হলো, নির্ধারিত সময়ে আগুয়া বাহিনী অতর্কিতে শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর সম্মুখ বাহিনীতে থাকা ও পরিখা মধ্যে থাকা বন্দুকধারীরা শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে তাদের রুখবে। শকটের সাহায্যে প্রতিরক্ষা ব্যূহ এমনভাবে সাজানো হলো যে প্রয়োজন মতো সেনারা যেমন খুসী এগিয়ে বা পিছিয়ে যেতে পারবে, সহজেই শত্রুসেনাকে ঘিরে ফেলতে পারবে। যে ভাবে বাবর ব্যূহ রচনা করলেন তাতে মধ্য বা কেন্দ্র বাহিনীও বেশ অল্প জায়গার মধ্যে রইলো, তাদের সহযোগিতা করার জন্য রইলো সামনের গোলন্দাজ ও বন্দুকধারীরাও।

এ যুদ্ধে বাবর যে নতুন ধরনের ব্যূহ রচনা ও সমর কৌশল প্রথম হিন্দুস্তানে প্রবর্তন করলেন তার পিছনে রয়েছে তার দীর্ঘকালের সমর-অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন মধ্য এশিয়ায় সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে অবলম্বিত কৌশলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। ইব্রাহীম লোদীর সেনাবাহিনীর পক্ষে এ কৌশল এক বিরাট ফাঁদ হয়ে দেখা দিল।

নিজের অসহিষ্ণু ও চতুরতাশূন্য পদক্ষেপের দ্বারা বয়স্ক আমীরদের শত্রু ক'রে তুলে ইব্রাহীম লোদী যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি রচনা করেছিলেন এবার তিনি তার সম্পূর্ণ শিকার হলেন। দিল্লী থেকে যাত্রার বেলা তিনি একলক্ষ সৈন্য ও এক হাজার রণহস্তী নিয়ে বার হলেও ১২ এপ্রিল যখন পানিপথে পৌছলেন তখন তার বাহিনীতে এক হাজার রণহস্তী ও পঞ্চাশ হাজারের বেশি সৈন্য ছিল না। আবার শত্রু সেনা থেকে আগে রণস্থলে পৌছেও তিনি দর্শকের মতো চুপ দাঁড়িয়ে থেকে বাবরকে সমর-প্রস্তুতির সুযোগও দিলেন। কোনরূপ আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সৈন্যবাহিনীর মনোবলকে উদ্দীপিত করার, তাদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টাও করলেন না। চেষ্টা করলেন না বাবরের সামরিক শক্তি ও সমরকৌশল জানবারও। শত্রুবাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থার উপরও কোন-রকম আঘাত হানার চেষ্টা করলেন না তিনি। আবার রাণা সংগ্রাম সিংহ ও পূর্বাঞ্চলীয় আফগান-প্রধানদের সাহায্য-সহযোগিতা সংগ্রহের চেষ্টাও এই অভিযান কালে তিনি করেননি। এ থেকে মনে করা যেতে পারে, বাবরকে তিনি একজন অসম প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে করেছিলেন। বহু সৈন্য দলত্যাগ সত্ত্বেও তার সৈন্যসংখ্যা বাবরের তুলনায় বেশি থাকার দরুন তিনি সম্ভবতঃ বাবরকে সহজে পরাজিত করতে পারবেন, এরূপ এক ধারণায় বিভোর হয়ে ছিলেন। হুমিদ খানের রণভঙ্গ ও হাতিম খানের পরাজয় তাকে সতর্ক ক'রে তুলতে পারেনি।

আট দিনের মধ্যেও যখন আফগানদের দিক থেকে কোন আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ সুরুর লক্ষণ দেখা গেলনা তখন নিজের পরিকল্পনা যাতে ভেস্তে না যায় সেজন্য বাবর সক্রিয় হয়ে উঠলেন। আফগানদের তাতিয়ে দেবার জন্য মেহদী খাজার নেতৃত্বে এক আগুয়া বাহিনীকে পাঠালেন আচমকা তাদের আক্রমণ করার জন্য। ১৯ ও ২০শে এপ্রিল দুদিন ধরে তারা শত্রু শিবিরে হানা দিয়ে তাদের প্ররোচিত ক'রে চললো আক্রমণ করার জন্য। তারা আফগান সেনাদের উপর তীর বর্ষণ ক'রে চললো, তাদের কতক সেনাকে বন্দী ক'রে মুণ্ড কেটে তা যুদ্ধের স্মারক রূপে শিবিরে নিয়ে গেল। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইব্রাহীম লোদী নিশ্চুপ বসে রইলেন। তখন, ২০শে এপ্রিল রাতে বাবর এক নৈশ অভিযানের পরিকল্পনা নিলেন। তারা প্রায় ভোর পর্যন্ত তাদের উপর হামলা ক'রে চললেন এবং তারপর রণবাদ্য বাজাতে সুরু করলেন। এতে বাবরের উদ্দেশ্য সফল হলো। সুলতান তার অবস্থান ত্যাগ ক'রে তার

সৈন্যবাহিনী নিয়ে এবার এগোতে আরম্ভ করলেন। নিজের সুরক্ষিত অবস্থান ত্যাগ ক'রে তিনি শুধু ভুলই করলেন না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবরের পাতা ফাঁকে গিয়ে পা দিলেন আগভর হয়ে।

যুদ্ধ শুরু হলো। কিন্তু বাবরের কৌশলের কাছে সুলতানের বাহিনী দাঁড়াতে পারলো না। তারা বাবরের ডানদিকের বাহিনীকে কেন্দ্র বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। সুলতান নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তার ডান ও বাঁয়ের বাহিনীকে বাবরের বাঁ ও ডান দিককার বাহিনী পুরো ঘেরাও ক'রে ফেললো। ফলে সুলতানের কেন্দ্র বাহিনী যেন যাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেল। বাবরের ডান ও বাম বাহিনী এবার যুদ্ধ শুরু করলে। শকটের আড়ালে স্থান নেয়া আগ্নেয়াস্ত্র বাহিনীও সুলতানের বাহিনীকে ব্যূহ রচনা ক'রে এবার চেপে ধরলো। সব দিক থেকে চাপের মধ্যে পড়ে গিয়ে আফগানেরা মাঝে এসে ভিড় জমালো। এক অসহায় পরিস্থিতি তখন। না রইলো ছত্রভঙ্গ দিয়ে পালাবার উপায়, না অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনী দিয়ে মুঘল বাহিনীকে আক্রমণের উপায়। ব্যূহ রচনা শেষ হতে মুস্তাফা ও ওস্তাদ আলী আফগান বাহিনীর উপর গুলি বর্ষণ শুরু ক'রে দিলে। রীতিমতো যুদ্ধ আরম্ভ হলো এবার। ডান বাহিনী এঁটে উঠতে পারছে না দেখে তাকে মদত দেবার জন্য আব্দুল আজিজকে পাঠালেন বাবর। সুলতান এগিয়ে এসে বাবরের নিজস্ব বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার বিন্যাস দেখে দমে গেলেন। না আছে এগোবার উপায়, না পিছোবার। সবদিক থেকে ঘেরের মধ্যে পড়ে অন্য কোন উপায় না দেখে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ ক'রে চললেন তিনি, অনুগামীদের সমানে অনুপ্রাণিত ক'রে চললেন শত্রুব্যূহ ভেদ করার জন্য। কিন্তু সব দিক থেকে চাপ খেয়ে অল্প জায়গার মধ্যে স্থান নিতে বাধ্য হওয়ায় তার বাহিনী মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সুলতানকে দেখতে না পেয়েও তাদের মনোবল ভেঙে পড়লো। ইতিমধ্যে তার ডান ও বাম বাহিনীও পিটুনী খেয়ে কাহিল অবস্থায়। তারাও তখন মার খেয়ে মাঝে এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। চলেছে তাদের উপর বাবরের আগ্নেয়াস্ত্র বাহিনীর অবিরাম অগ্নিবর্ষণ। তখন শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়া। দুপুরের মধ্যেই এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে যবনিকা পড়লো। যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে হাজার মৃতদেহের স্তূপ। খুব অল্প আফগানই প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে। মসুদ খান ইব্রাহীম লোদীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ক'রে

বীরের মতো মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় বলে বিচার করলেন তিনি। যুদ্ধ করতে করতেই একসময়ে লুটিয়ে পড়লেন রক্তেভেজা মাটির উপর। তার মৃতদেহকে ঘিরে প্রায় পাঁচ থেকে ছ হাজার যুবক ও বয়স্ক আফগান যোদ্ধার শবদেহ।

১৫২৬ অব্দের ২০শে এপ্রিল পানিপথের প্রান্তরে এই যে যুদ্ধ হলো এ আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের অসম লড়াই ছাড়া আর কিছুই না। ইব্রাহীম লোদীর অদূরদর্শী অযোগ্য নেতৃত্বের দরুনই পঞ্চাশ হাজার আফগান সেনাকে অসহায় ভাবে প্রাণ দিতে হলো। অপরদিকে বাবরের বিজয়ও যে যোগ্যতর নেতৃত্ব ও উন্নততর প্রযুক্তিকৌশলের বিজয় এতে সন্দেহ নেই।

এ যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে সাথে সাথে বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকারের জন্য পদক্ষেপ নিলেন। ছেলে হুমায়ূন ও খাজা কলানকে পাঠানো হলো আগ্রা-দখল অভিযানে। দিল্লী দখলের জন্য পাঠানো হলো মেহদী খাজা, মুহম্মদ সুলতান মীর্জা, আদিল সুলতান প্রভৃতিকে। ৪ঠা মে আগ্রায় পৌঁছলেন হুমায়ূন। গোয়ালিয়রের শাসক বিক্রমজিতের ও আফগানদের আপ্রাণ প্রতি-রোধকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিন কয়েকের মধ্যেই আগ্রা দখল ক'রে ফেললেন তিনি। দিল্লী দখল ক'রে নিতেও বিশেষ বেগ পেতে হলোনা।

২৯শে এপ্রিল বাবর পানিপথ ছেড়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চললেন দিল্লীর দিকে। যমুনা নদী পার হয়ে ঢুকলেন নগরে। পরিদর্শন করলেন বিভিন্ন মুসলিম সন্ত ও ফকীরদের স্মৃতি-সৌধ। তারপর যাত্রা করলেন আগ্রায়। ৯ই মে আগ্রার শহরতলী অঞ্চলে পৌঁছে সুলেইমান ফরমুলীর প্রাসাদে রাত কাটালেন। পরদিন আরো এগিয়ে ঠাঁই নিলেন জলাল খান জিগহাতের প্রাসাদে। তারপর শহরে ঢুকে নিহত সুলতান ইব্রাহীম লোদীর প্রাসাদে গিয়ে উঠলেন। হিন্দুস্তানের দুই রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা দখলের সাথে সাথে হিন্দুস্তান বিজয়ের প্রথম পর্ব সম্পূর্ণ করলেন তিনি।

এই রাজা বদলকে দেশের সাধারণ মানুষ কীভাবে গ্রহণ করেছিল? আফগানদের তারা মনের মানুষ বলে মেনে নিতে না পারলেও তারা ছিলেন ঘরের ছেলে, এই মাটিরই সন্তান। অন্যদিকে বাবর বাইরের ছেলে, পুরো বিদেশী। সুতরাং আফগানদের নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাবার স্বস্তি প্রথম পর্বে তাদের ঠিক আনন্দ-উদ্বেল ক'রে তুলতে পারলো না। বরং বাবরের দুর্জয় রণদক্ষতা ও অনলবর্ষী যুদ্ধাস্ত্রের খবর দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মনে আতংকের বন্যা জাগিয়ে দিলো। শহরের পর শহর, বসতির

পর বসতি জনশূন্য হয়ে গেল। দেশের গভীরে ও দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নেবার জন্য ছুটলো সবাই। পথেঘাটে চোরডাকাতের উপদ্রব ও লুটপাটের বিভীষিকাও শুরু হলো সেই সাথে।

পরিণতিতে বীর ও সমরকুশলী হিসাবে দেশে বিদেশে বাবরের খ্যাতি বিদ্যুতগতিতে ছড়িয়ে পড়লো অবশ্য। কিন্তু বিজিত সাম্রাজ্য সামলাতে, সেখানে শিকড় গেড়ে বসতে প্রথমপর্বে রীতিমতো হিমসিম খেয়ে গেলেন তিনি। সৈন্যদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ ও শাসনকার্যে সাধারণ মানুষের সাহায্য সহযোগিতা অর্জন বেশ দুরূহ হয়ে উঠলো তার পক্ষে। কিন্তু হিন্দুস্তান বিজেতা বাবর আর প্রথম সমরকন্দ বিজেতা বাবর এক মানুষ নন। জীবনের পাঠশালায় অভিজ্ঞতা নামের কামারের হাতুড়ির ঘা খেয়ে খেয়ে সবরকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করার মতো তীক্ষ্ণ ও শাণিত কঠিন ধাতুতে পরিণত হয়েছেন এখন তিনি। সবদিক বজায় রেখে সাধারণ মানুষের মন কীভাবে জয় করতে হয়, কী ভাবে নিজের অম্লান ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে হয় তার কৌশলও তিনি আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন। সুতরাং এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে বিরাট সময় লাগলো না তার। অবশ্য এখানে তিনি যে অপর্যাপ্ত ধন ঐশ্বর্য্য লাভ করেছিলেন তা এবং এখানকার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সম্পদও তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল এদিকে।

সাধারণ প্রজাদের যাতে লুটপাট ও পীড়ন করা না হয় প্রথম থেকেই বাবর সেদিকে সতর্ক ছিলেন। তবে আফগানদের ধনসম্পত্তি লুট ও ভূ-সম্পদ দখল ক'রে নেবার অনুমতি সৈন্যদের তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু যে সব আফগান ও আফগান প্রধান বাবরের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নেন তাদের প্রতি উদারতা দেখান হয়। অনেককে তার সেনাদলে ভর্তি ক'রে নেয়া হলো। অনেককে তাদের জায়গীর, জোতজমি ও বৃত্তি ফিরিয়ে দেয়া হলো। সুলতান বংশের যারা যারা জীবিত ছিলেন তাদের প্রতিও প্রতিশোধমূলক আচরণ না ক'রে উদার মনোভাব দেখালেন বাবর। ইব্রাহীম লোদীর মাকে মুক্তি দেয়া হলো। তাকে বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা আয়ের এক পরগণাও দিলেন বাবর। এভাবে সকলের কাছে তিনি দৃঢ়চেতা, উদার ও সুশাসক রূপে নিজের ভাবমূর্তি প্রোজ্জ্বল ক'রে তুলতে চাইলেন। সুশাসন উপহার দিয়ে সাধারণের মন থেকে তার সম্পর্কে অযথা ভীতি দূর করার পদক্ষেপ নিলেন।

অভিষেক অনুষ্ঠান সহ বাবর দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন কিনা

তা অবশ্য জানা যায় না। তবে এ উপলক্ষে সাধারণতঃ যে ধরনের দরবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা কিন্তু হয়েছিল। ঐই দরবারে তিনি হুমায়ুনকে তার কৃতিত্বের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা এবং হিসার ফীরুজ ছাড়াও সম্ভল অঞ্চল জায়গীর হিসাবে দেন। তাছাড়া আগ্রায় হুমায়ুন বাবরকে গোয়ালিয়রের রাজবংশের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যে হীরক খণ্ড উপহার দেন সেই বিশ্বখ্যাত 'কোহিনুর'ও এ সময়ে তাকে ফিরিয়ে দেন তিনি। অন্যান্য অনুগামীদেরও তিনি উদার ভাবে জায়গীর, খেতাব, উপহার প্রভৃতি দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। সমরকন্দ, খুরাসান, কাশগড় ও ইরাকে থাকা তার আত্মীয় স্বজনদের কাছেও বাবর উপহার স্বরূপ অর্থ পাঠালেন। এছাড়া সমরকন্দ, খুরাসান, মক্কা ও মদীনার প্রত্যেক অধিবাসীর কাছেও অর্থ পাঠান হলো। কাবুলের শহরতলী অঞ্চলে ও বদকশানের বরসক উপত্যকায় বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিককে এক শাহরুখী ক'রে দান করা হলো, তা সে মুক্ত নাগরিকই হোক আর দাসই হোক, স্ত্রী-লোকই হোক আর শিশুই হোক। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বাবর তার সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন সফল হওয়ায় আনন্দে কতো আত্মহারা হয়েছিলেন—হিন্দুস্তান বিজয় ক'রে তিনি কী পরিমাণ ধন সম্পদ লাভ করেছিলেন!

॥ এগার ॥

হিন্দুস্তানের সিংহাসনে বসে পূব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দু দিক থেকে দুই প্রবল শত্রুগোষ্ঠীর চাপের মধ্যে পড়ে গেলেন বাবর। পূব থেকে চাপের সৃষ্টি করলো আফগানরা। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে রাজপুতরা।

পানিপথের যুদ্ধে লোদী রাজবংশের পতন ঘটলেও আফগান উপজাতির প্রধানরা সারা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে ছিলেন। ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়কে তারা মুঘলদের হাতে আফগানদের চূড়ান্ত পরাজয় হিসেবে মেনে নিলেন না। নিজেদের অধিকার ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তারা সংঘবদ্ধ হয়ে মুঘলদের এ দেশের মাটি থেকে হটিয়ে দেবার চেষ্টায় ব্রতী হলো। সম্ভলে কাশিম খান সম্ভল, দুলপুর (ধউলপুর)-এ মুহম্মদ জৈতুন, গোয়ালিয়রে তাতার খান সারঙ্গখানী, রাপ্রীতে হাসান খান লোহনী, এটোয়ায় কুতব খান, কনৌজে আলম খান, বিহারে নাসির খান লোহনী ও মরুফ ফরমূলী এবং এরকম আরো বহু আফগান ও অন্যান্য আঞ্চলিক প্রধানরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। এদের একাংশ দরয়্যা খান নুহানীর ছেলে বিহার খানকে সুলতান মুহম্মদ নাম দিয়ে বিহারে সিংহাসনে বসালো। অন্য অংশ সুলতান হিসেবে ঘোষণা করলো ইব্রাহীম লোদীর ভাই মামুদ লোদীকে।

অন্যদিকে রাজপুত শাসকরাও মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হলো। রাণা সংগ্রাম সিংহ বহুদিন থেকেই আগ্রা পর্যন্ত রাজপুত সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে কম করেও ১৮টি যুদ্ধ করেছেন এবং সব কটি যুদ্ধেই তার জয় হয়েছে। এর ফলে তার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থ-সামর্থ্য সকলের শীর্ষে। তিনি ভেবেছিলেন তৈমুরের মতো বাবরও লুটপাট করেই ফিরে যাবেন। কিন্তু যখন দেখলেন বাবরের মতিগতি কিংবা পরিকল্পনা সে রকমের নয়, তিনি হিন্দুস্তানের বুকে সাম্রাজ্য গড়ে স্থায়ীভাবে এখানে শিকড় গাড়তে চাইছেন, তখন স্বভাবতই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিচার করতে শুরু করলেন। ভালভাবে এখানে শিকড় ছড়িয়ে বসার আগেই তাকে উপড়ে ফেলতে সচেষ্ট হলেন তাই।

আফগান প্রধানদের প্রথম থেকেই বাবর ছলে কৌশলে নিজের দলে টানবার চেষ্টা ক'রে আসছিলেন। পদ, জায়গীর ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির টোপ ফেলেছিলেন সেজন্য। অনেকেই এতে সাড়া দিয়েছিল। বহু

প্রধান তার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেছিল, অসংখ্য আফগান যোগ দিয়েছিল তার সেনাদলে। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে নাম করার মতো হলেন কোল বা আলিগড়ের শেখ ফুরন। নিরাপত্তা ও জায়গীরের প্রতিশ্রুতিতে তিনি তিরিশ হাজার সেনা ও তীরন্দাজ নিয়ে বাবরের পক্ষে যোগ দিলেন। এ ভাবে আনুগত্য স্বীকার ক'রে নেয়ার জন্য শেখ বায়জীদ ফরমূলীকে অযোধ্যায় জায়গীর দেয়া হলো। ফিরুজ খানকে দেয়া হলো জউনপুরে। মাহমুদ খান নুহানীকে ঘাজীপুরে। অন্যান্য গোষ্ঠীদের ক্ষেত্রেও এই একই নীতির অনুসরণ করলেন বাবর। সূচনায় এ নীতি সুফল দিলেও, শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিপদের কারণ হয়ে উঠলো।

বাবর ভেবেছিলেন, আফগান প্রধানদের সকলেই একে অন্যের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তার বশ্যতা মেনে নেবে। কিন্তু কার্যতঃ তা হলো না। আফগান ও রাজপুত দুই প্রতিপক্ষই তার সাম্রাজ্যের স্থিতির পক্ষে বিপদস্বরূপ হয়ে দেখা দিল।

দুই প্রতিপক্ষের সাথে একই কালে লড়াই অসম্ভব। পরামর্শ সভা ডাকলেন বাবর। স্থির হলো, আফগানদের বিরুদ্ধেই আগে পদক্ষেপ নেয়া হোক। হিন্দু-প্রধান দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তারা জনপ্রিয় নন, জনসাধারণের সাথে তাদের কোন আত্মিক সংযোগ নেই। সুতরাং প্রথমে তাদের হটানোই সহজ ও বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সিদ্ধান্তমতো হুমায়ুনকে পূর্বদিককার আফগান-দের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য পাঠানো হলো। ১৫২৬ সনের ২১শে আগষ্ট এজন্য বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আগ্রা থেকে রওনা হলেন হুমায়ুন। সফল হলো তার অভিযান। একে একে জউনপুর, ঘাজীপুর ও কাল্পী দখল ক'রে সেখানে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু পিতার কাছ থেকে ডাক পেয়ে অভিযানের পরবর্তী অংশ অসমাপ্ত রেখেই পরের বছরের ৭ই জানুয়ারী আগ্রায় ফিরে আসতে হলো তাকে।

এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিককার পরিস্থিতিও বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সেজন্যই পূব থেকে হুমায়ুনকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বাবরকে হটানোর জন্য ইব্রাহীম লোদীর ভাই মামুদ লোদী ও মেওয়াতের শাসক হাসান খান মেওয়াতী প্রভৃতির নেতৃত্বে আফগানরা রাজপুত রাজ্যসংঘের নায়ক সংগ্রাম সিংহের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছেন। সৃষ্টি হয়েছে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির, রাজপুত-মুঘল অনিবার্য সংঘর্ষের পরিবেশ। রাজপুতদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য বাবর বয়ান

দুর্গ অধিকারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বয়ান দুর্গাধীপ নিজাম খানের বড়ো ভাই থানাগড় দুর্গরক্ষক আলম খানকে তিনি হাত করলেন। তাকে দিয়ে বয়ান দুর্গ আক্রমণ করালেন। তাকে সাহায্যের জন্য তারদী বেগের অধীনে সেনাবাহিনীও পাঠান হলো। কিন্তু ব্যর্থ হলো তারা। আলম খান তার সমস্ত তল্পিতল্পা সহ বন্দী হলেন। এর পরেই রাণা সংগ্রাম সিংহ বয়ান অধিকারের জন্য তৎপর হলেন। দুর্গ-অধীশ নিজাম খান উভয় সঙ্কটে পড়লেন এবার। এদিকে বাবর তাকে গ্রাসের জন্য উদ্যত, ওদিকে রাণা সংগ্রাম সিংহ। অতএব যে কোন একজনের কবলস্থ হওয়া অনিবার্য জেনে, আত্মসমর্পণের প্রস্তাব ক'রে তিনি উভয়ের সাথেই আলাপ আলোচনা জুড়ে দিলেন। ঠিক এই আলোচনা কালেই মেওয়াতের শাসক হাসান খান মেওয়াতী সুলতান মামুদ লোদী ও রাণা সংগ্রাম সিংহের সাথে যোগ দিলেন। গড়ে উঠলো আফগান রাজপুত মৈত্রী।

এই পরিস্থিতিতে নিজাম খান তার কার্যকলাপ দ্বারা মুঘল রাজপুত বিরোধের আগুনে ধুনো ছড়িয়ে চললেন। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অবধারিত হয়ে উঠলো।

জানুয়ারীর শেষভাগে আফগান রাজপুত সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে রাণা সংগ্রাম সিংহ চিতোর থেকে যাত্রা করলেন মুঘলদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য।

এদিকে বাবরও রাণার পরিকল্পনা ও গতিবিধির বিশদ খবর পেয়ে গেলেন। নিজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ক'রে তার উদ্দেশ্য ভেস্তে দেবার জন্য তিনি বয়ান, জাহান নগর, গোয়ালিয়র ও ধউলপুর দখল ক'রে নেবার সিদ্ধান্ত করলেন। সেই মতো মুঘল বাহিনী ধউলপুর অধিকার ক'রে এগিয়ে গেল বয়ানের দিকে।

রাণাও এ খবর পেয়ে গেলেন। সাথে সাথে তিনিও নিজাম খানের কাছ থেকে বয়ান দুর্গ দখল ক'রে নেবার জন্য হাসান খান মেওয়াতীকে পাঠালেন। এ দিকে মুঘল সৈন্যও যে দুর্গ দখলের জন্য এগিয়ে আসছে নিজাম খান মনে হয় সে খবর রাখতেন না। তিনি তাই রাজপুত-আফগান বাহিনীর অভিযানে সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেই মুঘল দরবারে উপস্থিত হয়ে বাবরের কাছে দুর্গ সমর্পণ করলেন। এ ঘটনার পরে পরেই রাজপুত আফগান সেনাবাহিনী বয়ান দুর্গে হাজির হয়ে সেখানে উপস্থিত মুঘল সেনাদের হটিয়ে দুর্গ দখল ক'রে নিল। তারপর সেখান থেকে তারা মুঘল এলাকায় সামরিক তৎপরতা সুরু করলো।

অবস্থা এতো বিপদজনক হয়ে উঠলো যে বাবর তাদের দমন করার জন্য বয়ান অঞ্চলে মেহদী খাজাকে পাঠাতে বাধ্য হলেন। এ সময় পর্যন্তও বাবর জানতেন না যে রাণার সেনাবাহিনী মুঘলদের হাত থেকে বয়ান দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছে। মেহদী খান সেখানে পৌঁছে দুর্গ রাজপুত বাহিনীর দখলে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বাবরকে সব খবর পাঠিয়ে আরো সেনা পাঠানোর জন্য আবেদন জানালেন। বাবর সাথে সাথে সাহায্য পাঠালেন। খবর পাঠালেন তাদের সাহায্যের জন্য অল্পকালের মধ্যে তিনি নিজেও ঐ এলাকার দিকে অগ্রসর হবেন।

এই একই সময়ে রাণার সেনারা গোয়ালিয়র দুর্গ দখলের জন্যও সক্রিয় হয়ে উঠলো। দুর্গাধীশ তাতার খান সারঙ্গখানী কিছুকাল থেকেই আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জানিয়ে বাবরের কাছে সেজন্য দূত পাঠিয়ে চলছিল। কিন্তু বাবর নিজে রাজপুতদের বিরুদ্ধে সমর আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় সেখানে কাউকে পাঠাতে পারছিলেন না। এবার ধরমনকাত ও খান জহানের নেতৃত্বে রাজপুত বাহিনী গোয়ালিয়রে প্রবেশ করলো। দুর্গ দখলের জন্য চেষ্টাও আরম্ভ ক'রে দিল। তাতার খান আবার দুর্গ সমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে দূত পাঠালেন। এবার সাড়া দিলেন বাবর। কিন্তু মুঘল সেনা যখন সেখানে পৌঁছাল, তাতার খান ভিন্নরূপ ধরলেন। মুঘল সেনাপতি রহিম দাদ তখন কৌশলে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করলেন।

ব্যতিব্যস্ত ক'রে বাবরের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই একই কালে হামিদ খান সারঙ্গখানী ও অন্যান্য আফগান প্রধানরাও হিসার-ফীরুজের কাছে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তাদের অভ্যুত্থান দমনের জন্য চীন তৈমুর সুলতানের নায়কত্বে সেখানেও এক বিরাট সেনাদল পাঠাতে হলো বাবরকে।

বাবর নিজে ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৫২৭) আগ্রা থেকে যাত্রা শুরু করলেন। পথে, আগ্রা এলাকা পার হবার আগেই তার কাছে খবর এলো, রাণা সংগ্রাম সিংহ তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত গতিতে আগ্রা দখলের জন্য এগিয়ে আসছেন। মেহদী খাজা বয়ান দুর্গ দখল করতে ও রাণার বাহিনীকে হটিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তার এক আগুয়া বাহিনীকে রাজপুতেরা ১৬ই ফেব্রুয়ারী শোচনীয় ভাবে পরাস্ত ক'রে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। সব যুদ্ধেই যে সব সময়ে জিত হবে এমন কোন কথা নেই। দুঃসাহসী বাবরের দৃষ্টিভঙ্গি চিরকালই এরকম। সুতরাং গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না তিনি। বেপরোয়া এগিয়ে চললেন বয়ানের দিকে। এমন কি পথে মেহদী খাজার বাহিনীর সাথে দেখা হতে

তাদেরও সাদর সংবর্ধনা জানালেন। তাদের সাথে নিয়ে পৌছলেন আগ্রা ও সিক্রির মাঝে মধুকর এলাকায়। যুদ্ধের জন্য এখানেই ব্যূহাকারে সাজিয়ে নিলেন সেনাবাহিনীকে। তারপর জল ও যুদ্ধের উপযুক্ত খোলামেলা জায়গার সুবিধার জন্য সিক্রির দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। রাণার সেনাবাহিনী সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্যও লোক পাঠান হলো। তারা খবর আনল, এখান থেকে মাত্র ছ'মাইল দূরে বসাওয়ার নামের একটি স্থানে তারা উপস্থিত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আরো খবর সংগ্রহের জন্য আবার লোক পাঠালেন তিনি। কিন্তু কোন লাভ হলো না। শত্রু সেনার হাতে ধরা পড়ে গেল তারা। এ হলো ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা। এবার সামান্য একটু সরে গিয়ে খানুয়া গ্রামের কাছে অবস্থান নিলেন বাবর। পরিখা খননের হুকুম দিলেন। বাহিনীকেও যথাযথভাবে সাজানো হলো। পানিপথের ন্যায় এখানেও মোটামুটি একই যুদ্ধ কৌশল নিলেন, একইভাবে ব্যূহ সাজালেন। সমরাস্ত্রও প্রায় একই ধরনের। এছাড়া বাবর আরো একটি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তা হলো, বাহিনীর প্রত্যেকটি শাখাকে অন্যদের গতিবিধি, পরিস্থিতি এবং সমরকৌশলের পরিবর্তনাদি সম্পর্কে সর্বদা ওয়াকিবহাল রাখা।

বাবরের তুলনায় সংগ্রাম সিংহের সেনাবাহিনী অনেক বিপুল। বাবরের দেয়া হিসাব অনুসারে ছ'লক্ষেরও বেশি। একে অতিরঞ্জিত বলে মনে হলেও রাজপুত সেনারা যে মুঘলদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল এতে সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ একলাখের কাছাকাছি। বাবরের সৈন্যসংখ্যা সঠিকভাবে জানা না গেলেও বোধহয় বিশ হাজারের চেয়ে বেশি নয়। বয়ান দুর্গ দখল এবং মেহেদী খাজার অগ্রগামী দলকে পরাজিত ক'রে রাজপুতদের মনোবল নিঃসন্দেহে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অপরদিকে এ দুই ঘটনা, রাজপুতদের সংখ্যাধিক্য ও তাদের শৌর্যবীর্যের খ্যাতি মুঘল বাহিনীর মনোবল বেশ দুর্বল ক'রে তুলেছিল। কাবুল থেকে আগত এক জ্যোতিষীর ভবিষ্যতবাণীও তাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিল। বাহিনীকে মনোবলে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলার জন্য বাবর বিভিন্ন দিকে লুট-তরাজের জন্য পাঠাতে সুরু করলেন। এতেও যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হচ্ছে না দেখে তিনি অতি নাটকীয়ভাবে সুরা পান বর্জনের শপথ নিয়ে এভাবে তাদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলেন। জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ রূপে ঘোষণা করলেন হিন্দু রাজপুতদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামকে। এতে বেশ কাজ হলো। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই নতুন দুঃসংবাদ তার সেনাবাহিনীকে আবার দমিয়ে দিল।

খবর এল হুসেন খান রাপ্রী দখল ক'রে নিয়েছেন। কুতব খান অধিকার ক'রে নিয়েছেন চান্দোয়ার। সম্ভল ও কনৌজ থেকেও মুঘলদের বিতাড়িত করেছে আফগানেরা। মুঘলদের অধিকৃত গোয়ালিয়র দুর্গও অবরোধ করেছে তারা। এই দুঃসংবাদের ঢেউয়ে বেশ আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল সেনাবাহিনীর মধ্যে। দলত্যাগ শুরু হয়ে গেল। পরিস্থিতি জটিল হতে চলেছে দেখে বাবর সাথে সাথে তা রোধ করার জন্য যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দিলেন।

শনিবার ১৬ই মার্চ ১৫২৭ সকাল ৯ টা থেকে ৯-৩০ এর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। রাণা সংগ্রাম সিংহই আক্রমণ করলেন। রাজপুতদের বাম বাহিনী মুঘলদের ডান বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবার জন্য বিপুল বিক্রমে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুঘল বাহিনীর বেসামাল অবস্থা দেখা দিল। শুরু হলো বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা। বাবর তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য চীন তৈমুর সুলতানের অধীনে বাড়তি সেনা পাঠালেন সেদিকে। তৈমুরের প্রচেষ্টা কার্যকরী হলো। তিনি রাজপুতদের আক্রমণ প্রতিহত ক'রে তাদের বামবাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিতে সমর্থ হলেন। এর ফলে রাজপুতদের বাম ও মধ্য বাহিনীর মাঝে ফাঁকের সৃষ্টি হলো। এক অভাবনীয় সুযোগ দেখা দিল মুঘলদের জন্যে। গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক মুস্তাফা সাফল্যের সঙ্গে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। ছোট কামান ও বন্দুক নিয়ে দ্রুত সেখানে এগিয়ে গিয়ে অগ্নিবর্ষণ শুরু ক'রে দিলেন। এবার রাজপুত বাহিনীর মধ্যে ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অন্যদিকে মুঘলদের মনোবল উজ্জীবিত হলো। দারুণ উৎসাহে তারা রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাবর আরো সেনা পাঠালেন সেখানে একাধিক অধিনায়কের নেতৃত্বে। রাজপুতদের বামবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো। আহতের সংখ্যা ক্রমেই বিপুল হয়ে চললো।

বেসামাল রাজপুতেরা এবার বাবরের বাম বাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণের চাপ সৃষ্টি করলো। কিন্তু অণুপ্রাণিত মুঘল বাহিনী দক্ষতার সাথে সে চাপ প্রতিহত ক'রে তাদেরই পাল্টা আক্রমণ করলো। মুঘল গোলন্দাজ বাহিনী সমানে রাজপুতদের উপর আগুন ও পাথর বর্ষণ ক'রে চললো। আহতের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চললেও রাজপুতরা বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে চাপ বজায় রেখে চলতে থাকলো। কামানের বিরুদ্ধেও তারা তাদের অসামান্য সাহস ও বীরত্বের পরিচয় রেখে চললো। মুঘলদের সাহায্য করার জন্য সেখানে আরো সেনা পাঠাতে হলো বাবরকে।

ক্রমে ক্রমে যুদ্ধ সবদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর অবিরাম গোলাবর্ষণে রাজপুত সৈন্যদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে চললো। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরিস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত বাবর তার ঘরোয়া বাহিনীকে গোলন্দাজ বাহিনীর দুপাশ থেকে আক্রমণ করার আদেশ দিলেন। ডান বাহিনীর গোলন্দাজ শাখাকেও এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো। বিশাল কামান নিয়ে মধ্যভাগ থেকে ওস্তাদ আলী যে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এরা ডান দিক থেকে তার সেই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা ক'রে চললো। রাজপুত বাহিনীর মধ্যভাগ এবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। মৃতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকলো।

একসময়ে রাণা সংগ্রাম সিংহ নিজেও আহত হলেন। অম্বরের পৃথ্বীরাজ, যোধপুরের মলদেব রাও ও শিরোহীর অখাইরাজ রাও প্রভৃতি তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গোপনে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এ ঘটনার পরেও কিন্তু যুদ্ধ থামল না। মুঘলদের হারিয়ে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে রাজপুত প্রধানরা প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ ক'রে হলবাদের রাণা অজ্জকে অধিনায়কত্বে বরণ ক'রে নিয়ে তার মাথার উপরে ছত্র তুললো। তাকে উদ্দীপ্ত করা হলো শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু রাণা সংগ্রাম সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে নেই এ সংবাদ বেশিক্ষণ সেনাদের কাছে গোপন রইলো না। ফলে রাজপুত সেনাবাহিনী মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দিল ও ছত্রভঙ্গ দিয়ে পলায়ন শুরু হয়ে গেল। প্রায় দশ ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর এভাবে বাবরের স্বপক্ষে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো।

পরদিন সকালে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করলেন বাবর। মুঘল পক্ষের যারা হতাহত হয়েছে তাদের তালিকা করা হলো। শত্রুপক্ষীয়দের মধ্যে যারা নিহত হয়েছেন তাদের মাথা কেটে এনে স্তম্ভ তৈরী করা হলো মোঙ্গল প্রথামতো। তারপর বিজয় উৎসবের মধ্য দিয়ে 'ঘাজী' উপাধি গ্রহণ করলেন তিনি।

পানিপথের যুদ্ধে বিজয় অপেক্ষাও এই যুদ্ধে বিজয় বাবরের জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে আফগানদের এবং বিশেষভাবে শৌর্য-বীর্যের গৌরব গরিমার দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী রাজপুতদের প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খাকে ধূলিসাৎ ক'রে তিনি আপন সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা ক'রে তুললেন। এরপর আফগানরা আবার রণক্ষেত্রে তার মুখোমুখি হলেও সফল হতে পারল না। কাবুলের পরিবর্তে দিল্লীই এবার বাবরের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কেন্দ্রপীঠ হয়ে উঠলো।

সফল হলো কিশোর বয়স থেকে দেখে আসা তার সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন।

শব্দ-সূচী

স্থান, পাহাড়, নদী

ব্যক্তি, জাতি ও অন্যান্য